দেবেশ রায়

ইতিহাসের লোকতান

শ

শঙ্কর প্রকাশন । কলিকাতা-৬

রমা ও সমরেশ রায়

কল্যাণীয়দের

This book is...to be received as...something not required, but spontaneously offered, which may be ignored or criticized, but which does not warrant blame...

Sidney-Beatrice Webb

Soviet Communism : a New Civilisation *1937*

লেখকের অন্যান্য গ্রন্থ

উপন্যাস

যযাতি
আপাতত শান্তিকল্যাণ হয়ে আছে
মফস্বলি বৃত্তান্ত
স্বামী স্ত্রী
তিস্তাপারের বৃত্তান্ত
সহমরণ
জীবনচরিতে প্রবেশ
হনন আত্মহনন
আত্মীয় বৃত্তান্ত
বেঁচে বর্তে থাকা

গল্পগ্রন্থ

দেবেশ রায়ের ছোট গল্প

প্রবন্ধ

রবীন্দ্রনাথ ও তাঁর আদিগদ্য
সময় সমকাল
উপন্যাস নিয়ে
আঠার শতকের বাংলা গদ্য
উপনিবেশের সমাজ ও বাংলা সাংবাদিক গদ্য

ইতিহাসের লোকজন

এক

আত্মজীবনযাপন শেষ করার আগেই তাঁর আত্মজীবনীর সামনে সৌরাংশুকে প্রশ্নাতুর থমকাতে হয়।

রুটিনে সৌরাংশুর ক্লাশ ছিল এগারটায়, তিনি তাই শমিতাকে বারটা নাগাদ সময় দিয়েছিলেন। কিন্তু গতকালই তিনি ছেলে-মেয়েদের, পারলে, সাড়ে দশটার মধ্যেই চলে আসতে বললেন। শমিতার জন্যে নয়, শমিতা ত অপেক্ষা করতেই পারে, এমন-কি শমিতাকে আর-একদিনও আসতে বলা যায়। ক্লাশটার জন্যে ভাবতে গিয়ে সৌরাংশুর মনে হল—উন্নয়নের সমস্যা আর কৃৎ-কৌশলের স্বয়ম্ভরতা নিয়ে কথাগুলো একটানা বলে দিতে পারলে ছেলেমেয়েরা তাঁর বক্তব্যের যুক্তিকাঠামোটা ধরে নিতে পারবে, মাঝ-খানে দু-চার দিনের ফাঁক পড়ে গেলে সেই কাঠামোটা ধরতে ওদের অসুবিধে হবে। আধঘণ্টা আগে শুরু করলে তিনি দেড়ঘণ্টা মত সময় পাবেন।

নিজের ঘরে পৌঁছতে পৌঁছতে তাঁর সোয়া দশটাই হয়ে যায়। যাদবপুর থেকে তাঁর বাড়ি জ্যামহীন প্রায় ঘণ্টাখানেকের উত্তুরে পথ।

এটা ত ঠিক সে-অর্থে ক্লাশও নয়। এম. এ. ক্লাশের শেষ বছরের ছাত্রদের পঞ্চাশ নম্বরের একটা রচনা লিখতে হয়। তবে, তাঁর এ-ক্লাশটা শুনতে হয়ত অনার্সের ছেলেমেয়েরাও কেউ-কেউ এসে যেতে পারে। বিকেলের দিকে কোনোদিন নিলেই ভাল হত—শেষ করার সময়ের বাঁধাবাঁধি থাকত না। কিন্তু বিকেল খালি পাওয়া সৌরাংশুর পক্ষে প্রায় অসম্ভব। বিশ্ববিদ্যালয়ের নানারকম মিটিঙ থাকে, সরকারি-আধাসরকারি মিটিঙও থাকে বিকেলেই,

সেমিনার-টেমিনারও হয় দুটো-তিনটে নাগাদ। সেজন্যে সৌরাংশু অনেকদিনই এ-রকম ভাগ করে নিয়েছেন—পড়ানো সকালে, অন্য কাজ বিকেলে।

দু-চার বছর আগে পর্যন্ত, যখন সৌরাংশুর শরীরমন মজবুত ছিল, এই নিয়ে সৌরাংশু নিজেই নানারকম রসিকতা করতেন—প্রিলাঞ্চ সেশন, পোস্টলাঞ্চ সেশন, বা সকালটা হচ্ছে লেবারটাইম আর বিকেলটা হচ্ছে সারপ্লাস লেবারটাইম। সৌরাংশুর এই নিয়ে ব্যাখ্যাবিশ্লেষণও অনেকের জানা। আমাদের মত প্রাক্তন উপনিবেশে সবকিছুই ত অ্যালিস ইন দি লুকিং গ্লাস। অর্থাৎ ডাইনেরটা বাঁয়ে আর বাঁয়েরটা ডাইনে। বিজ্ঞান-অনুযায়ী, লেবার থাকলে তবে তার সারপ্লাস থাকতে পারে কিন্তু আমাদের দেশে নাকি সারপ্লাস থাকলে তবে লেবার হবে। যেমন, সৌরাংশু উদাহরণ দিতেন, ক্রিকেট কন্ট্রোল বোর্ডের কর্তা কখনো তারা হবে না যাদের শুধু লেবার আছে, মানে যারা শুধুই খেলে ; কর্তা হবে তারা যাদের সারপ্লাস আছে অর্থাৎ কোনো দিনই যারা খেলেনি। মোহনবাগান ক্লাবের বেলাতেও তাই।

সৌরাংশু আজকাল আর এ-রকম রসিকতা করেন না। এ-সব রসিকতা নিয়ে তাঁকে খোঁচানোর লোকও কমে এসেছে। কমে এসেছে ঠিক নয়, এমন রসিকতায় তাঁরই আর উৎসাহ নেই বলে, অন্যদেরও উৎসাহ ধীরে-ধীরে কমে গেছে। তারা অন্য কোনো রসিকতা পেয়ে গেছে—সেখানে সৌরাংশু নিজেকে আর রবাহুতও করেন না। ক্রিকেট আর মোহনবাগান ছিল সৌরাংশুর ধ্রুবক। ক্রিকেটও ঠিক নয়, শুধুই গাভাসকার। তিরিশ-চল্লিশ বছরের স্বামী-স্ত্রী যেমন সমস্ত রকম 'চল'কে তাঁদের সম্পর্কের কাঠামোতে সামলে দিতে পারেন, সৌরাংশু তেমনি তাঁর মনের ও মননের প্রক্রিয়াগুলিকে ক্রিকেট আর মোহনবাগান দিয়ে রূপ দিতে পারেন। জীবনের সঙ্গে আষ্টেপৃষ্ঠে বাঁধা থাকলে এমন নানা বাচন তৈরি করে তোলা যায়। তেমন বাচন যে সৌরাংশুর কমে আসছে তার এমন কোনো কারণ বাইরে থেকে নেই, কিন্তু কোথাও জীবনের সঙ্গে বা বৃত্তির সঙ্গে তাঁর বন্ধনের ক্ষয় ঘটে গিয়ে থাকতে পারে। এমন ক্ষয়, যা তিনি নিজেই টের পান না। এমন ক্ষয়, যা প্রথম

প্রকাশ হয় রসিকতা থেকে অচেতন সরে আসায়। তখন, যাঁরা তাঁর বাচনের সঙ্গে খুব পরিচিত ছিলেন না, তাঁরা আচমকা তাঁর কথা শুনলে বাক্যের উদ্দেশ্য-বিধেয় ধরতে পারতেন না। বক্তব্যের ওপর যে-কর্তৃত্ব থাকলে বাক্যের ভিতর উপমা নিয়ে এমন খেলা খেলা যায় সে-কর্তৃত্ব ত কমেনি সৌরাংশুর, বরং, যেন মনে হয় আরো প্রতিষ্ঠিতই হয়েছে। নাকি, এত বেশি অনড় প্রতিষ্ঠার অর্থ বক্তব্যের ভিতর থেকে চলচ্ছক্তি শুকিয়ে যাচ্ছে। সৌরাংশুর বক্তব্য সৌরাংশুর নিজেরই জানা হয়ে গেছে, অন্যদের ত বটেই? নাকি, সৌরাংশু আর জানতে চাইছেন না।

সৌরাংশুর এখনো অবিশ্যি এটুকু মনে হয়, তিনি পড়াতেই ভালবাসেন। ছেলেমেয়েদের তরুণ, কৃশ, অপরিণত, চিকন অথচ আতত মুখমালা দেখে দিনটা শুরু করতে তাঁর ভাল লাগে। এই তারুণ্যের কোনো একটি মুখের পেশিও অতিব্যবহারে ঝুলে পড়েনি—বরং যেন পেশির আর মেধার বয়সোচিত সীমা তারা শুধু আগ্রহের আঘাতেই ভেঙে ফেলতে চায়। পোশাক-আশাক চলন-বলনের ঔদাসীন্য বা অতিরেক সেই ভাঙনেরই চিহ্ন। তার চিন্তার বাইরে কেন জগৎ আছে—এই এক অস্থিরতায় যেমন কোনো-কোনো তরুণ মুখ উগ্র হয়ে উঠতে চায় বা কোনো-কোনো তরুণী শরীর প্রচলিত পোশাকের নিগড় ভেঙে ফেলতে চায় তেমনি আবার কেউ-কেউ ত তার অনুভবের বাইরে কোনো জগৎ নেই এই আত্মবিশ্বাসে কেমন মিশে যায় চৈত্রের এই রোদের সঙ্গে বা মাঘের সেই বাতাসের সঙ্গে।

সৌরাংশু এই মুখমালার আয়নায় নিজের মনের জেগে ওঠা প্রশ্ন, সংশয়, উত্তর, সম্ভাব্য সমাধান যাচাই করে-করে দেখেন। সহকর্মী বা সমবৃত্তির মানুষজনের সেমিনারের চাইতেও তাঁর তাত্ত্বিক জিজ্ঞাসার অনেক মীমাংসাই করে দেয় এই তরুণ মুখ-গুলির চাউনি, শ্বাসপতন, হাসির রেখা। সৌরাংশু যখন পড়ান তখন এই অদৃশ্য বিনিময় ঘটে যেতে থাকে আর এক মানবনাট্য জমে ওঠে। ছেলেমেয়েরাও সেই মানবনাট্যের একরকম স্বাদ পায়। তাঁর প্রায় পঁয়ত্রিশ বছরের মাস্টারিতে এখন এটা বুঝে গিয়েছেন সৌরাংশু, ছেলেমেয়েরা যে তাঁর কাছে এতটা স্বচ্ছন্দ হয়ে পড়ে,

ক্লাশের বাইরেও যে তাঁর সঙ্গে একটু কথা বলতে চায় বা তাঁর একটু সঙ্গ চায় তার একমাত্র কারণ হয়ত এই যে তিনি বিষয়টিকে ছেলে-মেয়েদের বোধের কাছে পৌঁছে দিতে পারেন, বোধের বেশি কাছে পৌঁছে দিতে পারেন। শুধু একজন ভাল মাস্টার বলেই ছেলে-মেয়েরা তাঁর প্রতি এই টান বোধ করে? সৌরাংশু সেটাই ভেবে এসেছেন, সেটাই ভেবে যেতে চান। রোগী যেমন ডাক্তারকে বিশ্বাস করতে চায়, ভাঙা যন্ত্র নিয়ে যেমন লোকে মিস্তিরির ওপর ভরসা করতে চায়, ছেলেমেয়েরাও সে-রকম মাস্টারের ওপর নির্ভর করতে চায়।

কিন্তু এই কথাগুলো এখন মনে করতে হচ্ছে কেন তাঁকে যখন তিনি সেই মুখগুলিরই দিকে তাকিয়ে-তাকিয়ে নিজের আপাত-নিরুত্তাপ স্বরে উচ্চাবিত তথ্যের পর তথ্য নিজেও শুনে যাচ্ছেন? শুধু দর্পণের কাছে দাঁড়িয়ে কি কেউ দর্পণের প্রশংসা করে? নাকি, নিজের কানেই নিজের বলা তথ্যগুলো শুনতে-শুনতে সৌরাংশু দ্বিধায় পড়ছেন, কোনো একরকমের অনির্দিষ্ট দ্বিধায়, যে এগুলো কি একটা কোনো তত্ত্বের সাধারণ্যে পৌঁছে যাবে তেমন অনায়াসে যা তাঁর অভ্যস্ত বলে তাঁরই বিশ্বাস ছিল?

সৌরাংশু বলছিলেন, আজকের পৃথিবীতে কোনো দেশই কৃৎ-কৌশলে স্বয়ংসম্পূর্ণ নয়, হতে পারে না, হওয়ার দরকার নেই। ধরা যাক, তিন-তিনটি উন্নত দেশ, মানে অসমাজতান্ত্রিক উন্নত দেশ, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র, ইয়োরোপিয়ান কমিউনিটি আর জাপান। এই দেশগুলি পরস্পরের সঙ্গে এক প্রবল বিনিময়ে ব্যস্ত—পেটেন্টের বিনিময়, কৃৎকৌশলের বিনিময়, কৃৎকুশলী ও বৈজ্ঞানিক বিনিময়, মেশিন ও উৎপাদনপদ্ধতির বিনিময়। ১৯৭০ পর্যন্ত জাপান বাইরে থেকে কৃৎকৌশল, টেকনোলজি, শুধু কিনে গেছে আর আজ ইস্পাতশিল্পে, মোটরকার শিল্পে, কমপিউটার শিল্পে ও বায়ো-টেকনোলজিতে জাপান কৃৎকৌশল বিক্রি করছে। যুক্তরাজ্য অনেক-গুলো ব্যাপারে একচেটিয়া কৃৎকৌশলের দখল কায়েম রেখেছিল। আজ তাকে যুক্তরাষ্ট্র, জাপান, জার্মানি ও ফ্রান্সের কাছে হেরে যেতে হচ্ছে।

কিন্তু এগুলো কি ঘটছে শুধু আটলান্টিকের দুই পারে?

দক্ষিণ কোরিয়া আর তাইওয়ান যুক্তরাষ্ট্রের সঙ্গে বাণিজ্যে রপ্তানি থেকে বিরাট টাকা সঞ্চয় করেছে। দক্ষিণ কোরিয়ার ইস্পাত ও ও জাহাজের বিক্রি আটলান্টিকের দুই পারেই আতঙ্ক ছড়িয়ে দিয়েছে। এখন আর ধনতান্ত্রিক দেশগুলিকে গরিব ধনতন্ত্র আর বড়লোক ধনতন্ত্র বলে পৃথক করা যাবে না।

সৌরাংশু তাঁর ভূমিকার সিদ্ধান্তের দিকে খুব শান্ত স্বরে এগিয়ে যেতে চান। প্রচুর তথ্য যেমন নিরাসক্তভাবে তিনি উদ্ধৃত করতে পারেন অলস গতিতে, তেমনি অত্বর গতিতে পৌঁছে যেতে পারেন তাঁর সিদ্ধান্তে। পৌঁছে যাওয়ার পর শ্রোতারা বোঝে, সিদ্ধান্তটা বলা হয়ে গেল। সৌরাংশু তাঁর সেই অভ্যাসেই বলছিলেন।

কিন্তু ব্রাজিল, দক্ষিণ কোরিয়া আর তাইওয়ান এখনো বহিরাগত, তারা এখনো ধনতান্ত্রিক দেশগুলির নিজেদের ভিতর-কার প্রতিযোগিতায় ঢুকবার জন্যে ধাক্কাধাক্কি করছে। এদের বাইরে অসংখ্য যে-সব দেশ ধনতান্ত্রিক দুনিয়ায় পড়ে আছে, বরং যাদের বলা যায় অসমাজতান্ত্রিক, তারা এই প্রতিযোগিতায় কোথাও নেই।

সৌরাংশু থামেন। কিন্তু পরবর্তী কথাটিতে যাবার আগে তিনি একবার ছেলেমেয়েদের মুখগুলোর ওপর দিয়ে চোখ বোলান। এদের কারো মাথায় কি এই প্রশ্নটা উঠে পড়েছে—সৌরাংশু যে অসমাজতান্ত্রিক দেশের কথা বলছেন তা কি আর এখন গ্রাহ্য কোনো সংজ্ঞা? নাকি, প্রধান ধনতান্ত্রিক দেশগুলির বাইরে অন্য সব দেশ সমাজতন্ত্র-ধনতন্ত্র নিরপেক্ষভাবে একইরকম পশ্চাৎপদ? বা, হয়ত তাদের পশ্চাৎপদতার মধ্যে পার্থক্য আছে কিন্তু সমাজ-তান্ত্রিক আর অসমাজতান্ত্রিক এই বিভাজন সৌরাংশু এখন করছেন কোন নিরিখে?

সৌরাংশু নিজের যুক্তিকে ভিতরে-ভিতরে নিজেই আক্রমণ করে ছাত্রছাত্রীদের মুখের দর্পণে দেখতে চান তাঁর এই অন্তর্ঘাত তাঁর ছেলেমেয়েরাও বুঝে নিল কি না। সৌরাংশু তাঁর দর্পণকে কি ঠকাতে চাইছেন, না, সেই দর্পণের বিশ্বস্ততা পরীক্ষা করছেন?

নিজের ভিতরে-ভিতরে বিপরীত জিজ্ঞাসা জাগিয়ে রেখে

সৌরাংশু তখন বলছেন যে কৃৎকৌশলের কোনো একটি দিকের ওপর আধিপত্য কি উন্নয়নের নিরিখ? ব্রাজিল এরোপ্লেন বানিয়ে রপ্তানি করছে, অস্ত্র বানিয়ে বেচছে, কম্পিউটার বানিয়ে ব্যবহার করছে আর তার বৈদেশিক ঋণের পরিমাণ ১৯৮৭-তে দাঁড়িয়েছিল ১০৯ বিলিয়ন মার্কিন ডলার, মানে ১ কোটি ৯ লক্ষ কোটি ডলার।

সৌরাংশু বোর্ডে যান। সংখ্যার এই বৃহত্ত্বকে তিনি কখনো উচ্চারিত শব্দের মধ্যেই আটকে রাখেন না, তাকে বাস্তব হিশেবে ছেলেমেয়েদের ধারণার ভিতর ঢুকিয়ে দিতে চান। যদি সংখ্যাটা জ্যোতির্বিজ্ঞানের সংখ্যার মত তাদের ধারণার বাইরে চলে যায়, তা হলে এই ধারণাতীতকেই তিনি তাদের সামনে উপস্থিত করেন। বোর্ডে সৌরাংশু ১০৯ সংখ্যাটি লিখে তার পেছনে ০০০০০০০০০০০০ বারটি শূন্য এঁকে লেখেন '১ কোটি ৯ লক্ষ কোটি মার্কিন ডলার।' অর্থাৎ '১.০৯×১০১৪ মার্কিন ডলার।'

ইতিমধ্যেই ছেলেমেয়েদের ঠোঁটে বাতাসটানার আওয়াজ উঠেছে। বোর্ড থেকে মুখ ফিরিয়ে সৌরাংশু বলেন, 'যদি কারো সংখ্যা ভাল লাগে ভারতীয় টাকার সঙ্গে মার্কিন ডলারের বর্তমান বিনিময়মূল্য দিয়ে এই সংখ্যাকে গুণ করে নিতে পারো। তাহলে ভারতীয় টাকার অঙ্কে ব্রাজিলের বৈদেশিক ঋণটা কল্পনা করতে পারবে বা কতটা অকল্পনীয় তার একটা আন্দাজ পাবে।'

চকটা টেবিলের ওপর রেখে দু-হাতের আঙুল ঘষে চকের গুঁড়ো ঝেড়ে ফেলতে-ফেলতে সৌরাংশু নিস্তব্ধ ছাত্রছাত্রীদের সামনে মাত্র তাঁর ভূমিকাটুকুর সিদ্ধান্ত উচ্চারণ করেন, 'এশিয়া, আফ্রিকা ও লাটিন আমেরিকার দেশগুলির কৃৎকৌশলের স্বয়ংসম্পূর্ণতা, আর্থিক পরনির্ভরতা ও অনন্যোপায় পশ্চাৎপদতা— এই সবগুলো বিষয়কে একসঙ্গে পুনর্বিবেচনা করতে হবে।' সৌরাংশু নিজের করতল থেকে ক্লাশের দিকে মুখ তোলেন।

দেখেন, ক্লাশ যেন একটা মুখ হয়ে তার মুখের দিকে তাকিয়ে আছে। শ্বাসপতনের আওয়াজও যেন শোনা যাবে—অনাটকীয় নাট্যময়তায় সৌরাংশু তাঁর প্রধান উপপাদ্যে কোন দক্ষতায় প্রবেশ করেন? সৌরাংশুর ব্যক্তিত্ব নাটুকেপনার বিরোধী। ধুতিপাঞ্জাবিতে

আর নির্বাধ শুদ্ধ বাঙলা উচ্চারণের স্বাচ্ছন্দ্যে সেই অনাটকীয়তার সচেতন চর্চা। কিন্তু বিষয়ের সঙ্গে সম্পূর্ণ অভেদ থেকে এই ধুতিপাঞ্জাবি আর এই বাঙলাই একটা বিপরীত নাট্যও তৈরি করে তোলে। সেই নাট্যই এখন এই ক্লাশে তৈরি হয়ে গেল।

সৌরাংশু কি তাঁর এই বিষয়ের সঙ্গে এখনো অভেদই আছেন? পুনর্বিবেচনা? তাহলে সমাজতন্ত্রের পুনর্বিবেচনা নয় কেন—কৃৎকৌশলের এমন স্বয়ম্ভরতা সেখানে নতুন পশ্চাৎপদতা যে তৈরি করল!

কী বলবেন তা সৌরাংশুর এতই স্পষ্ট জানা যে এখন তাঁর বক্তৃতার প্রথমাংশে তিনি অর্থনৈতিক পশ্চাৎপদতার কারণগুলোর কথা এক নম্বর, দুই নম্বর করে একটু সরলভাবে বলে দিয়ে, স্বয়ং-সম্পূর্ণতার সংজ্ঞা পেরিয়ে কৃৎকৌশলের আবিষ্কার ও আত্তীকরণের জটিলতম প্রসঙ্গটিকে যেন ছুঁতে পারছেন। এই যুক্তিপরম্পরাটা তিনি ছাত্রছাত্রীদের বোধের কাছে ধরিয়ে দিতে চান বলেই এমন একটা লম্বা ক্লাশ নিতে চেয়েছিলেন। অথচ তাঁর ভূমিকার কথাটুকু শেষ হতে না-হতেই তাঁর মনে সন্দেহ জাগছে তিনি কি পারবেন তাঁর ভিতরের প্রশ্ন এড়িয়ে শুধু এক তাত্ত্বিকতা নিয়ে এতদূর এগতে?

উনিশ শতকে ব্রিটেন, যুক্তরাষ্ট্র, বেলজিয়াম ও কিছু পরে ফ্রান্স বড়-বড় কলকারখানায় বেশি-বেশি উৎপাদন করে অর্থনৈতিক উন্নয়নের প্রাথমিক ধারণাটির ভিত তৈরি করেছিল। তার আগে কি আমরা কখনো এক দেশের সঙ্গে আর-এক দেশের আর্থিক তুলনা করতে পেরেছি? বা, করতে চেয়েছি? শিল্পনির্ভর ধনতন্ত্র আলাদিনের দৈত্যের মত বা লঙ্কাকাণ্ডের হনুমানের মত—সে নিজেকে ক্রমেই না-বাড়িয়ে বাঁচতে পারে না। যুক্তরাষ্ট্র ও ইয়োরোপের দেশগুলো তাদের মেশিন বানানোর শিল্পের সম্প্রসারণ ঘটিয়ে ব্রিটেনের সম্প্রসারণ রুখে দিল গত শতকের প্রথমার্ধেই। শিল্পপুঁজি যখন একচেটিয়া পুঁজিতে বদলে গেল, তখন জাতীয় পুঁজির সম্প্রসারণ একটা মারাত্মক প্রক্রিয়া হয়ে উঠল। যে-সব দেশ শিল্পপুঁজি গড়ে তুলতে পারল না, নিজেদের বাজার বাড়াতে পারল না, নতুন টেকনোলজি দখল করতে পারল

না তারা অর্থনৈতিক দিক থেকে অনেক পেছিয়ে পড়ল, তাদের বৃদ্ধি বা বাড় আটকে গেল। এ-সব দেশের অনেকগুলিই ত ছিল কলোনি—যেমন ভারত বা ইন্দোনেশিয়া, অনেকগুলিই ত ছিল আধা-কলোনি—যেমন চীন, কিন্তু অনেক দেশই ত ছিল স্বাধীন —ব্রাজিল, পেরু, কোলাম্বিয়া, মেক্সিকো। ১৯১৪ সাল পর্যন্ত এই শোষণের কলোনিগুলিকে শুষে শাদা করে দেয়া হয়েছে—সাম্রাজ্যের উন্নতির প্রয়োজনে। ফলে, এই সমস্ত দেশের স্থানীয় ব্যবসায়ীরা উদ্যোগ হারিয়ে ফেললেন। সব ব্যাবসাতে টাকা খাটাবার অধিকার তাঁদের ছিল না, শিল্প তৈরির অনুমতিও ছিল না। দ্বিতীয়ত, কলোনির প্রজাদের জমিতেই আটকে রাখার নীতি অনুসরণের ফলে জমিদার-কৃষি ব্যবসায়ী-মহাজন একাকার হয়ে গেল। কলোনির অর্থনীতির ওপর গ্রামের বেকারি আর আধা-বেকারির পেছুটান ক্রমেই বাড়তে লাগল। বাগিচা-খনি-কারখানায় শ্রমিকদের কাছ থেকে সবচেয়ে বেশি পরিমাণ কাজ আদায়ের জন্যে কলোনিতে লেবার কনট্রাক্টার তৈরি হল, ফলে, শিল্পে শ্রমিক নিয়োগের কোনো আধুনিক ব্যবস্থা গড়ে উঠল না। এত কম পয়সায় এত শ্রমিককে দিয়ে এত উৎপাদন যেখানে হয় সেখানে নতুন টেকনোলজি বা কৃৎকৌশলের প্রয়োজন কেউ বোধ করে না। ভারতেই তখন যে-কজন ইনজিনিয়ার তৈরি হত তারা চাকরি পেত না। ফলে কলোনি বা প্রাক্তন কলোনিগুলি সাহেবদের দিকে প্রার্থীর মত তাকিয়ে থাকত শুধু টেকনোলজির জন্যে নয়, সেই টেকনোলজির ব্যবহার জানার জন্যেও।

এই পরিবেশে টেকনোলজির জন্যে পরনির্ভরতা থেকে পরিত্রাণ কোথায়? কাকেই-বা বলব টেকনোলজির স্বয়ম্ভরতা? সে স্বয়ম্ভরতা ত কোনো অপরিবর্তনীয় জিনিশ নয়। স্বয়ম্ভরতার কথা যখন ভাবা হবে তখন ত এ-কথা মনে রাখতে হবে সেই জনগোষ্ঠীর যখন যা প্রয়োজন তা যেন তার অধিগত টেকনোলজি নির্বাহ করতে পারে, সেই জনগোষ্ঠী যেন তার প্রয়োজনবোধ পরিবর্তন করতে পারে, সেই জনগোষ্ঠী যেন পরিবেশের পরিবর্তন সামাল দিতে পারে। যখন যে-টেকনোলজি দরকার তখন সেই টেকনোলজি আমদানি করা, গ্রহণ করা ও হজম করা, যাকে বলে

আত্তীকরণ, আর, যখন যে-টেকনোলজি প্রয়োজন তখন সেই টেকনোলজিতে উত্তরণ, এমন-কি যদি আমদানি করা না যায়, তা হলেও সেই টেকনোলজি তৈরি করে তোলা—একটা দেশের উৎপাদন ব্যবস্থায় এই ক্ষমতা নিহিত থাকলে তাকেই আমরা বলি টেকনোলজির স্বয়ম্ভরতা। সেই স্বয়ম্ভরতা ত আসতে পারে এক মুনাফার লোভে, আরো-আরো বেশি মুনাফার লোভে। যে-দেশে মজুরি কম সে-দেশে টেকনোলজি রপ্তানি করে মুনাফা বাড়ানো ত বহুজাতিক প্রতিষ্ঠানগুলির একটা প্রকাশ্য কায়দা। জেনারেল মোটরস্ ও আরো কয়েকটি বহুজাতিক প্রতিষ্ঠান দক্ষিণ কোরিয়াকে টেকনোলজি দিল যাতে শস্তায় গাড়ি বানিয়ে দক্ষিণ কোরিয়া-সহ বাইরের বাজারে বেশি লাভে বেচা যায়। আর, সব দেশের ত একই রকম বা একই পরিমাণ টেকনোলজির স্বয়ম্ভরতা দরকার নয়। যে-দেশ রাজনৈতিক ভাবে যুক্তরাষ্ট্রের বিরোধী তার ত, যে-দেশ রাজনৈতিকভাবে যুক্তরাষ্ট্রের ওপর নির্ভরশীল, তার চাইতে অনেক বেশি পরিমাণ স্বরম্ভরতা দরকার। কোন নিরিখে, ভিয়েতনাম আর নিকারাগুয়ার স্বয়ম্ভরতার পরিমাণ আর ইস্রায়েল-তাইওয়ানের স্বয়ম্ভরতার পরিমাণ তুলনা করা হবে? তাই টেকনোলজির স্বয়ম্ভরতার ধারণাটি সব সময় আপেক্ষিক। তার আপেক্ষিকতারও বহুমাত্রা আছে।

মুনাফার লোভ ছাড়া আর কী পদ্ধতিতে টেকনোলজি স্বয়ম্ভর হয়ে উঠতে পারে? পারে, রাজনৈতিক সমাবেশের জোরে। তার সবচেয়ে বড় উদাহরণ যখন এক নবীন সমাজতান্ত্রিক দেশ তার দেশবাসীকে উদ্বুদ্ধ করে তোলে, সমস্ত সম্পদকে ব্যবহারে লাগাতে পারে, উৎপাদন ক্ষমতার গুণগত বদল ঘটিয়ে দিতে পারে—শুধু রাজনৈতিক সমাবেশের শক্তিতে, শুধু রাজনৈতিক সংকল্পের সংহতির শক্তিতে। সোভিয়েত বিপ্লবে তাই ঘটেছে, চীনে তাই ঘটেছে, কিউবায় তাই ঘটেছে, ভিয়েতনামেও তাই ঘটেছে।

এইখানে থেমে যান সৌরাংশু। তাঁর ছেলেমেয়েদের মুখের ওপর দিয়ে চোখ বোলান। না, কারো মুখে শোনা কথা আরো একবার শোনার ক্লান্তি ছাপ ফেলেনি। না, কোনো মুখে কোনো প্রশ্ন নেই। যেন সত্যি বোধ করতে পারছে—অর্থনীতির ভিতর

এক মানবশক্তির সঞ্চার। কিন্তু সৌরাংশু দু-তিন বছর আগে, সোভিয়েত ও পূর্ব ইয়োরোপের পরিবর্তনের আগে, যে-উদারণমালা সাজিয়ে তুলতেন, এখন আর তা তোলেন না। এখনো তিনি তাঁর যুক্তির কাঠামোর ভিতর আছেন। এখনো তিনি নিজে নিজের কাছে কিছু লুকিয়ে রেখে বাইরে সাজিয়ে কিছু বলছেন না। কিন্তু সেই উদাহরণমালা সাজাতে গেলেই তিনি নিজের ভিতরে এক বিপরীত প্রশ্নের সম্মুখীন হবেন। যে-রাজনৈতিক সংকল্প ও সমাবেশের শক্তি মস্কো মেট্রো তৈরি করে, একক বিচ্ছিন্নতায় নতুন টেকনোলজি আয়ত্ত করে আর মর্তসীমা লঙ্ঘন করে গাগারিনকে পাঠায় মহাশূন্যে—সেই রাজনৈতিক সংকল্প ও সমাবেশ তার সম্পূর্ণ বিপরীত অবস্থানে চলে যায় কেন? টেকনোলজির ওপর মানুষের প্রভুত্ব কী করে তাকে সেই ব্যবস্থাকেই ধ্বংস করতে আর-এক বিপরীত কর্মসূত্রে গ্রথিত করে তোলে। ধনতন্ত্র নিজের ভিতরেই তার ধ্বংসের কারণ তৈরি করে তোলে—এই আস্তিক্য আর জ্ঞানতত্ত্ব ত সৌরাংশুর ব্যক্তিত্বের আর চরিত্রের ওতপ্রোত উপাদান। আজ অবসর নেয়ার আগে তাঁকে শুধু এই সত্যের সামনেই দাঁড়াতে হচ্ছে না যে ধনতন্ত্র নিজের ভিতরেই নিজেকে বারবার সংকটমুক্ত করার ও বাঁচিয়ে তোলার উপাদান তৈরি করে তুলতে পারে, ধনতন্ত্রের মধ্যেই নিহিত আছে আরোগ্যের এক শেষহীন উৎস; সৌরাংশুর এ-পর্যন্ত মেনে নিতেও কোনো আপত্তি ছিল না কারণ তিনি জানেন অর্থনীতির দুনিয়াজোড়া খেলাতে এ-রকম পর্যায় কখনো-কখনো আসতে পারে বৈকি; কিন্তু তাঁকে যে এখন এই সত্যটিও মেনে নিতে হচ্ছে যে সমাজতন্ত্র নিজের ভিতরেই তার ধ্বংসের কারণ তৈরি করে তোলে, সমাজতান্ত্রিক ব্যবস্থাই সমাজতন্ত্রের সবচেয়ে বড় শত্রু। সৌরাংশু তাঁর আস্তিক্য ও জ্ঞানতত্ত্বের বিপরীতের সঙ্গে নিজের সারাটা যাপিত জীবনকে মেলাবেন কী করে?

সৌরাংশু তাঁর এই ছাত্রছাত্রীদের মুখের ভিতর থেকে তাঁর জিজ্ঞাসার জবাব চান, নাকি, এই ছাত্রছাত্রীদের কাছেই তিনি স্বীকারোক্তির অনুমতি চান? স্বীকারোক্তি কেন? সৌরাংশুর আস্তিক্য আর জ্ঞানতত্ত্ব কেন এমন এক হয়ে গিয়েছিল, কেন তিনি

তাঁর জ্ঞানতত্ত্বকে তাঁর আস্তিক্যে পরিণত হতে দিয়েছিলেন, কেন সৌরাংশু তাঁর আস্তিক্যকেই তাঁর জ্ঞানতত্ত্বে পরিণত করেছিলেন? সেটা কি অপরাধই হয়ে গেছে? সৌরাংশু কি সারাজীবন একটা অপরাধীর জীবন যাপন করলেন? তা হলে ত সৌরাংশুকে তাঁর ছেলেমেয়েদের সামনে স্বীকারোক্তিই করতে হয়! কিন্তু সৌরাংশু বোধহয় আত্মসমর্পণ করতে চান। তাঁর কোনো স্বীকারোক্তি নেই, তাঁর শুধু আত্মসমর্পণ আছে। তাঁর স্বীকারোক্তি ত উচ্চারিত হচ্ছে সোভিয়েতের প্রজাতন্ত্রে-প্রজাতন্ত্রে, পূর্ব ইয়োরোপের দেশে-দেশে। সৌরাংশু নিজেকে এক মানবভবিতব্যের অংশ ভেবে এসেছেন। কিন্তু কী পরিহাস! তাঁকে এখন মানব-অভিজ্ঞতার এক স্বীকারোক্তিকে ব্যক্তিগত স্বীকারোক্তি হিশেবে মেনে নিতে হচ্ছে। সৌরাংশু জেনে এসেছেন, তিনি ইতিহাসের কথাই উচ্চারণ করেন। সহসা তাঁকে আবিষ্কার করতে হল, তাঁর ব্যক্তিগত ব্যর্থতার কথাই ইতিহাসে প্রমাণিত হয়ে যাচ্ছে। সুপ্রিম সোভিয়েতে গর্বাচভের ভাষণ, জর্জিয়ার শোকস্তব্ধ মিছিল, সেসেস্কুবিরোধীদের উল্লাস আর বার্লিনদেয়ালের ভগ্নস্তূপের ওপর জয়ধ্বনি যে তাঁকে এমন ব্যক্তিগত ভাষণ, মিছিল, উল্লাস ও জয়ধ্বনি বলে মেনে নিতে হবে—তার প্রস্তুতি ত সৌরাংশু কখনো নেননি?

নাকি নিয়েছেন, শুধু তাইই এতদিন নিয়ে এসেছেন? তাঁর বছর চোদ্দ বয়সে বার্লিনে হিটলারের হেডকোয়ার্টারে লাল পতাকার উত্তোলন আর তাঁর শেষ যৌবন থেকে ভিয়েতনামের যুদ্ধ ত তাঁকে ব্যক্তিগত উল্লাস আর জয়বোধ এনে দিয়েছে। এ কি তাঁর ঋণশোধ? কিন্তু ঋণটা কোথায় কখন কার কাছে করেছিলেন সৌরাংশু। তাঁর দেশের মাটিতে দারিদ্র্য আর যন্ত্রণার যে-অস্তিত্বের ভিতর তিনি থেকেছেন, থাকছেন—তাতেই কি তাঁর উল্লাস আর জয়বোধের নান্দনিক স্বপ্নের ঋণশোধ নয়?

যে-স্বীকারোক্তি ভিন্ন মহাদেশে, ভিন্ন আকাশের নীচে, ভিন্ন ভাষায় উচ্চারিত হয়ে গেছে, হচ্ছে, আরো হবে, তা মেনে নিয়ে সৌরাংশু শুধু আত্মসমর্পণই করতে পারেন।

সৌরাংশু একটু সময় নিচ্ছেন ভেবে ছেলেমেয়েরা নড়েচড়ে বসে, কেউ-কেউ নোট করছিল—তারা উল্টে দেখে ক পাতা হল, কেউ-

কেউ রুমাল দিয়ে মুখ মোছে, কেউ-কেউ ঘাড় ঘুরিয়ে জামার হাতায় ঠোঁট মুছে নেয়, দুটি-একটি কথাও শোনা যায়।

সৌরাংশু ভাবেন, বলে দেন, এই পর্যন্ত থাক। কিন্তু তার মানেই ত আবার একদিন বলতে হবে। অথবা তিনি কি এতটা বলেছেন যে শেষ করে দেয়া যায়? কিন্তু সে ত তঞ্চকতা হবে। তিনি বলছেন টেকনোলজির স্বয়ম্ভরতা-পরনির্ভরতা ও অর্থনৈতিক অনুন্নয়নের সমস্যা নিয়ে। অথচ এখনো অর্থনৈতিক অনুন্নয়ন সম্পর্কে প্রায় কিছুই বলেননি। কাকে 'অনুন্নয়ন' বলবেন সৌরাংশু এখন? কোন সংজ্ঞায় তিনি ছেলেমেয়েদের 'অনুন্নয়ন' চেনাবেন?

'১৯৪১ সালের ৬ জানুয়ারি দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের' পর্যন্ত বলতেই গলাটা আটকে যায় সৌরাংশুর। তিনি মুঠো পাকিয়ে একটু কেশে গলাটা পরিষ্কার করে নেন। ফলে, আবার যখন তিনি শুরু করেন, '১৯৪১ সালের ৬ জানুয়ারি দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের' তখন তাঁর মনে হয় কথাগুলির ওপর যেন অতিরিক্ত জোর পড়ছে, তিনি স্বরটা নামিয়ে আনেন, 'সবচেয়ে খারাপ সময়ে প্রেসিডেণ্ট রুজভেল্ট তাঁর একটি বিখ্যাত বক্তৃতায় ঘোষণা করেছিলেন, ভবিষ্যতের পৃথিবী চারটি প্রধান অভাব থেকে মুক্ত পৃথিবী হিশেবে গড়ে উঠবে। তাঁর সেই তালিকায় প্রধান ছিল, বা পরবর্তীকালে হয়ত সবচেয়ে প্রাধান্য পেয়েছে, ফ্রিডম ফ্রম ওয়াণ্ট। আমি জানি না, ওয়াণ্ট শব্দটিকে আমি কোন বাংলা শব্দ দিয়ে বোঝাব। অভাব? না দারিদ্র্য? একটা কি এমন কোনো শব্দ আছে যা দিয়ে, যাকে বলে উন্নত দেশ সেই দেশগুলির ওয়াণ্ট বা অভাব, আর বাংলা-দেশের, বা বাংলাদেশেরই-বা কেন, অনেক দেশেরই, ওয়াণ্ট বা অভাবকে বোঝানো সম্ভব? অর্থনীতি ত সূত্রের শাস্ত্র, সে-কারণেই সে বিজ্ঞানের এত ঘনিষ্ঠ। কিন্তু অর্থনীতি কি এমন কোনো সূত্র বানাতে পেরেছে যা দিয়ে পৃথিবীর দারিদ্র্যের সমতা মাপা সম্ভব? দারিদ্র্যই ত অনুন্নয়নের প্রধানতম ভিত্তি।'

পৃথিবীতে উন্নত দেশ আর অনুন্নত দেশের মধ্যে যখন সম্পদের সমান বণ্টনের কথা ভাবা হয়, তখন অনুন্নত দেশের আভ্যন্তরীণ দারিদ্র্য দূরীকরণের সমস্যার কথা ভাবা হয় না। তলস্তয়ের 'রেজারেকশন' উপন্যাসে মাসলোভাকে সাইবেরিয়ায় নির্বাসনে

পাঠানো হয়, নেখলুদভ দেখেন এ ত সেই কিশোরী যাকে তিনি ধর্ষণ করেছিলেন ও তারপর যার দায়িত্ব নেননি। জুরির আসনে বসে তিনি সিদ্ধান্ত নেন—এই নারীকে রক্ষার জন্যে যা কিছু করার দরকার তাই আমি করব ও এখনই করব। কোনো-কোনো উন্নত দেশ এ-রকম দায়দায়িত্বের বোধ থেকে পৃথিবীর কোনো-কোনো দেশের দারিদ্র্য দূর করতে গেছেন যাকে কোনো-কোনো অর্থনীতিবিদ্ বলেছেন 'ঘটনাক্রম'। কিন্তু তেমন 'ঘটনাক্রম' আরো অনেক ঘটনাক্রমের দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হতে থাকে। ফলে উন্নত দেশ থেকে অনুন্নত দেশের দারিদ্র্যমোচনে একই সঙ্গে সক্রিয় হয়ে ওঠে অনেকগুলি আপেক্ষিক ঘটনা। নতুন যুদ্ধের প্রস্তুতির জন্যে অনুন্নত দেশে সামরিক ঘাঁটি তৈরি হয়, সে-দেশের অর্থনীতিতে উন্নত দেশের দেদার টাকা ঢালা হতে থাকে আর এডাম স্মিথ যে-জুতোর উদাহরণ দিয়ে বলেছিলেন—প্রয়োজনীয় জিনিশ বলতে জীবনযাপনের অপরিহার্য উপকরণগুলিকেই কেবল তিনি ধরেন না, ইংল্যাণ্ডে একজন অতিদরিদ্র লোকও জুতো ছাড়া বাইরে বেরতে পারেন না, সেখানে জুতো তাই জীবনযাপনের অপরিহার্য উপকরণ না হয়েও অপরিহার্য প্রয়োজন—সেই জুতোই উন্নত দেশ থেকে অনুন্নত দেশে ঘটনাক্রমে টাকা পাঠানোর আর-এক প্রতীক হয়ে ওঠে। ইমারেল্ডা মার্কোস দেড় হাজার জোড়া জুতোতেও তৃপ্তি পান না।

'কিন্তু এটা নিশ্চয়ই একটু একপেশে কথা। এমন একপেশে কথা বলে নিতে হয় কোনো কোনো অর্থনীতিবিদের আন্তর্জাতিক সম্পদবণ্টন সম্পর্কে আর-একধরনের একপেশে কথার বিরোধিতায়। তেমনি একজন এমন কথাও বলেছেন, সমস্ত রকম পশ্চাৎপদতার ব্যাখ্যায় সাম্রাজ্যবাদ আর পরাধীনতাকে কারণ হিশেবে দেখানো বড় সেকেলে ব্যাপার।'

মোট জাতীয় উৎপাদন বা মাথাপিছু জাতীয় আয় দিয়ে উন্নয়ন-অনুন্নয়ন মাপাটাও প্রতিদিনই সেকেলে হয়ে যাচ্ছে। সামাজিক বৈষম্যও ক্রমেই প্রয়োজনীয় নিরিখ হয়ে উঠছে।

সৌরাংশু চক নিয়ে বোর্ডে যান। 'ওয়ার্ল্ড ডেভেলাপমেন্ট রিপোর্ট, ১৯৮৯', থেকে তিনি কতকগুলি সংখ্যা লেখেন ছেলে-

মেয়েদের শুধু এটুকু জানাতে যে যুক্তরাষ্ট্রের জনস্বাস্থ্য ব্যবস্থা অনেক-অনেক গরিব দেশের চেয়েও খারাপ আর তাতে ক্ষতি সবচেয়ে বেশি হয় কালদের, ব্ল্যাকদের। মাথাপিছু জাতীয় উৎপাদনে যুক্তরাষ্ট্র পৃথিবীর দ্বিতীয় সম্পন্নতম দেশ হলেও জন্মপিছু গড় আয়ুতে যুক্তরাষ্ট্র বারটি দেশের নীচে, ত্রয়োদশতম স্থানে আরো গোটা ছয়েক অনুন্নত দেশের সঙ্গে গুঁতোগুঁতি করছে, নিউইয়র্কের হারলেমে একজন কাল মানুষের চল্লিশ বছর বয়সে পৌঁছনোর সম্ভাবনা দুর্ভিক্ষপীড়িত বাংলাদেশের একজন মানুষের চাইতেও কম, ৩৫ থেকে ৫৪ বছর বয়েসে কালরা শাদাদের থেকে ২-৩ গুণ বেশি মারা যায়। তেমনি আবার নিম্ন আয়ের দেশগুলির মধ্যে সবচেয়ে বেশি বৃদ্ধি ঘটেছে চীন, পাকিস্তান, শ্রীলঙ্কায়। চীন ও শ্রীলঙ্কার আভ্যন্তরীণ উৎপাদনে বিনিয়োগও সবচেয়ে বেশি—যথাক্রমে ৩১ শতাংশ ও ৩৬ শতাংশ। মাঝারি আয়ের ১৮টি দেশের বেলাতেও যে-তিনটি দেশের সবচেয়ে বেশি আয়, সেই তিনটি দেশেরই আর্থিক বিনিয়োগ সবচেয়ে বেশি—যুগোস্লাভিয়া ৩৫ শতাংশ, রোমানিয়া ৩৪ শতাংশ আর দক্ষিণ কোরিয়া ৩১ শতাংশ।

এতে প্রমাণ হয় আর্থিক আয়ের সঙ্গে উন্নয়নের সম্পর্কটা অঙ্গাঙ্গী। কিন্তু এতে প্রমাণ হয় না, আর্থিক আয় আর উন্নয়ন এক ও অভিন্ন। উন্নয়ন ও পশ্চাৎপদতা মাপার অন্য নিরিখ দরকার।

সৌরাংশু বোর্ড থেকে সরে টেবিলের পাশে এসে দাঁড়ান। তাঁর বোর্ডের লেখাগুলির মধ্যে কোনো আঁকিবুঁকি নেই, ঠিক যে-তথ্যটি জানাতে চান, সেই তথ্যটিই সাজানো।

টেবিলের পাশে এসে দাঁড়িয়ে দুই হাতের আঙুল ঘষে-ঘষে চকের গুঁড়ো ফেলে দিতে-দিতে সৌরাংশু নিজের হাতের দিকে তাকিয়ে বলে যান। ছেলেমেয়েদের কাছে তাঁর এই ভঙ্গিগুলি এত চেনা যে তিনি বোর্ডে লেখা শেষ করে একটু কোনাকুনি দাঁড়িয়ে তাঁর কথাগুলি বলতে শুরু করলেই ছেলেমেয়েরাও যেন অপেক্ষা করে তিনি কখন টেবিলের পাশে এসে নিজের আঙুলগুলো মেলাবেন ও নিজের হাতের উপর চোখ নামিয়ে আনবেন। ছেলেমেয়েদের সেই প্রত্যাশিত ভঙ্গিতে দাঁড়িয়ে সৌরাংশু বলছিলেন, 'কথাটা এটা নয় যে আয় দিয়ে দেশের উন্নতি মাপা যায় কি না।

কথাটা এই যে শুধু আয় দিয়েই কি সব উন্নতি মাপা যায়। হিশেব নিলে দেখা যাবে মানুষের গড় আয়ুবৃদ্ধিতে, শিক্ষাপ্রসারে, স্বাস্থ্যব্যবস্থায়, উচ্চশিক্ষার সংগঠনে ব্রাজিল, মেক্সিকো, দক্ষিণ কোরিয়া, চীন ও শ্রীলঙ্কার মত বিচিত্র ও বিবিধ মাথাপিছু আয়ের দেশগুলির মধ্যে একধরনের সমতা রয়েছে।'

চীন ও শ্রীলঙ্কার মাথাপিছু জাতীয় উৎপাদন ব্রাজিল ও মেক্সিকোর সাত ভাগের এক ভাগ। অথচ তাদের নাগরিকদের গড় আয়ু সমান। দক্ষিণ কোরিয়ার আর্থিক বৃদ্ধি নিয়ে ত কথার শেষ নেই অথচ মাথাপিছু পাঁচগুণ বেশি আয় সত্ত্বেও, চীন বা শ্রীলঙ্কার গড় আয়ু দক্ষিণ কোরিয়া পেরতে পারেনি।

'আর্থিক আয় উন্নয়নের একটি অবলম্বনমাত্র কিন্তু উন্নয়নের একমাত্র অবলম্বন নয়। অমর্ত্য সেন তাঁর একটি নিবন্ধে প্রমাণ করে দেখিয়েছিলেন শ্রীলঙ্কা ঐ দেশের লোকজনের গড় আয়ু যতদূর বাড়িয়েছে তদ্দূর যদি আর্থিক আয় বাড়িয়ে উন্নয়ন ঘটিয়ে বাড়াতে চাইত তা হলে তার লাগত ৫৮ থেকে ১৫২ বছর। টাকায় সব কিছু পাওয়া যায় বটে, কিন্তু কোনো-কোনো ক্ষেত্রে বড় ধীরে, বড় দেরিতে পাওয়া যায়।'

টেকনোলজির স্বয়ম্ভরতা, পরনির্ভরতা ও অনুন্নয়নের সমস্যার সমাধানে অর্থনীতিবিদ্‌রা এখানেই সবচেয়ে বড় ভুল করে বসেন। তাঁরা শুধু হিশেব করেন জাতীয় উৎপাদন কত, মোট আয় কত, জিনিশপত্রের মোট সরবরাহ কত। তারা কোনো সময়ই হিশেব করেন না এই আয়ের ওপরে, এই পণ্যের ওপরে, এই সরবরাহের ওপরে জনসাধারণের স্বত্ব প্রতিষ্ঠিত হল কি না, সেই স্বত্বপ্রতিষ্ঠার সামর্থ জনসাধারণ অর্জন করল কি না। শেষ পর্যন্ত ত অর্থনৈতিক উন্নয়নকে এটাই সাব্যস্ত করতে হবে মানুষজন কী করতে পারছে, আর কী করতে পারছে না—তারা বেশিদিন বাঁচতে পারছে কি না, তারা নিরাময়যোগ্য ব্যাধিতে মরছে কি না, তারা খেতে-পরতে পারছে কি না, তারা লেখাপড়া শিখতে পারছে কি না, তারা শিল্প-সাহিত্য-বিজ্ঞানের চর্চা করার অবকাশ পাচ্ছে কি না, শেষ পর্যন্ত কার্ল মার্ক্স-এর কথা-অনুযায়ী হিশেব কষতে হবে, 'পরিস্থিতি বা ঘটনা ব্যক্তিকে নিয়ন্ত্রণ করবে না, ব্যক্তিই

পরিস্থিতি বা ঘটনাকে নিয়ন্ত্রণ করবে।'

সৌরাংশু থেমে যান। তিনি উন্নয়নের অর্থনীতির যুক্তিগুলোকেই পরপর সাজাচ্ছিলেন কিন্তু অনিবার্যভাবে এসে পড়লেন ঠিক সেই প্রসঙ্গে, যে-প্রসঙ্গ তিনি এড়াতে চাইছিলেন। তিনি ত অর্থনীতি পড়েছেন, ব্যক্তির এই নিয়ন্ত্রণের বিজ্ঞানের সূত্র জানতে। তিনি ত অর্থনীতি পড়েছেন, চোখের সামনে সোভিয়েত ইউনিয়নকে রেখে। সে-দেশে অর্থনীতির প্রত্যেকটি প্রধান সূত্রকে উল্টে দেয়া হয়েছিল মানবিক উপাদানের সমাবেশ ঘটিয়ে। এখন তাঁকে ক্লাশে তাঁর ছেলেমেয়েদের সামনে মনে-মনে আত্মজীবনী বিচার করতে হবে, সেই জীবনীর অর্থ ও অর্থহীনতা। সৌরাংশু ত আলাদা করে জানেন না, কোনোদিনই জানেননি, কোন-কোন উপাদানে তাঁর আস্তিক্য আর জ্ঞান গড়ে উঠেছিল। দেশের উন্নয়ন, জাতির উন্নয়ন, আর্থিক উন্নয়ন, বাণিজ্যের উন্নয়ন, জীবনযাপনের উন্নয়ন—এগুলো ত তাঁর কাছে কখনোই পৃথক উপাদান ছিল না, অথচ, এই উপাদানগুলির পার্থক্য ও বৈশিষ্ট্য তাঁর জ্ঞানতত্ত্বেরও নিশ্চিত অংশ। সেই নিশ্চয়তা ত এসেছিল মানবসমগ্রতা সম্পর্কে প্রত্যক্ষ আস্থা থেকে। পুঁজির দাসত্ব থেকে মুক্ত মানুষ পুঁজিকে তার দাসে পরিণত করেছে—এই নিশ্চয়তায় স্থির থেকে অংশগুলির সমগ্রতা নিয়ে চর্চায় ত সেই সমগ্রতাই পুষ্ট হয়েছে। কিন্তু এখন সেই সমগ্রতার ধারণাই খণ্ড-বিখণ্ড হয়ে পড়ে আছে সোভিয়েত ইউনিয়নে, সমাজতান্ত্রিক ব্যবস্থায়। সৌরাংশু তা হলে কোন সমগ্রতার পটে অর্থনীতির এই অংশগুলিকে বিচার করবেন? সৌরাংশু আত্মজীবনযাপন শেষ করার আগেই তাঁর আত্মজীবনীর সামনে প্রশ্নাতুর থেমে আছেন।

না, তিনি আজ আর এ বিষয়ে বলতে পারবেন না। কেবল আজই পারবেন না, তা নয়, তিনি বিষয়টি এখানেই শেষ করে দিতে চান। অনেকক্ষণ ত বলেছেন। অনেক রকম কথাই ত বললেন। ছেলেমেয়েরা শুনল। কেউ-কেউ নোটও নিয়েছে। তাতেই তাদের কাজ হয়ে যাবে—একটা রচনা লেখার ত ব্যাপার, তাও যদি এই রচনাটিই আসে।

কিন্তু সৌরাংশু ত চিরকাল ছাত্র-ছাত্রীদের পড়াতে-পড়াতেই

তাঁর চিন্তাভাবনাগুলিকে পরীক্ষা করে এসেছেন, যাচাই করে এসেছেন। সেই অভ্যাসে তিনি একবার পুরো ক্লাশের ওপর ধীরে-ধীরে চোখ বুলিয়ে নেন—তাঁর এই ছেলেমেয়েরা কেউ কি ভিতরে-ভিতরে জেনে নিল যে সৌরাংশু তাঁর আত্মজীবনীগত কারণে থেমে গেলেন ?

'এই থাক,' সৌরাংশু রেজিস্টারটা হাতে নেন, 'আমি তোমাদের কী কী পড়তে হবে তার একটা লিস্ট দিয়ে দেব।'

সৌরাংশু ক্লাশ থেকে বেরিয়ে যাওয়ার দরজার দিকে পা বাড়ানোর পর ছেলেমেয়েরা উঠে দাঁড়ায়। বেরিয়ে যেতে-যেতে সৌরাংশুর মনে হয়, একটু কি চকিতে দাঁড়িয়ে পড়ল ? কোথাও কি আচম্বিত কিছু ঘটে গেল ? ক্লাশটা যে শেষ হয়ে গেল, তা কি ওরা বুঝে উঠতে পারেনি ? নাকি প্রসঙ্গটাই একটু হঠাৎ শেষ হয়ে গেল ? কতক্ষণ বললেন তিনি ? ঘড়ি না দেখে ঘাড় নিচু করে করিডরে পেঁছে নিজের ঘরের দিকে হেঁটে যান সৌরাংশু।

সৌরাংশুর টেবিলের বাঁদিকে জানলা, ডানদিকে দরজা। ক্লাশে যাবার সময় তাঁর চেয়ার জানলার দিকে ঘোরানো ছিল? কেন? নাকি তিনি ক্লাশে বেরিয়ে যাবার পর টেবিল-চেয়ার মোছা হয়েছে? তিনি ত আজ একটু আগেই এসেছিলেন। টেবিল-চেয়ার যে কী মোছা হয় তা অবিশ্যি বোঝার উপায় নেই। নাকি তিনি ক্লাশে যাবার আগে ওরকম জানলার দিকেই ঘুরে বসেছিলেন ? জানলায় তাকিয়ে কি তিনি আজকের ক্লাশের অপ্রতিরোধ্য আত্মজিজ্ঞাসার জন্যে প্রস্তুতি নিয়েছিলেন ? সৌরাংশু মনে করতে পারেন না, ক্লাশে যাওয়ার আগে কি তিনি জানতেন—ক্লাশে পড়াতে-পড়াতেই তাঁকে নিজের সম্মুখীন এমন ভাবে হতে হবে ? তিনি কি সেই সম্মুখীনতা এড়াচ্ছিলেন, ইচ্ছাকৃত এড়াচ্ছিলেন বলেই এমন অপ্রস্তুত হতে হল তাঁকে ? নাকি নিজের মনের ভিতরে-ভিতরে সেই সম্মুখীনতা তৈরি হয়ে উঠেছিল বলেই ক্লাশে তা তাঁর ভিতরে এমন নিরুপায় বিস্ফোরণ ঘটাল ? ছেলেমেয়েরা কি কিছু টের পেল ? কোথাও নাটকীয় কিছু ঘটে কি ?

চেয়ারটাকে না ঘুরিয়ে, নিজেই চেয়ারটার পেছন দিয়ে ঘুরে খুব ধীরে আলগোছে চেয়ারে বসলেন। হেলান দিলেন না। বাঁ

হাতটা কোলের ওপর এলিয়ে থাকল, ডান কনুই টেবিলের ওপর রাখায় আঙুলগুলি প্রায় ঠোঁট পর্যন্ত উঠে এল। এটা হয়ত সৌরাংশুর ভাবনার একটা ভঙ্গিই। কিন্তু কোথাও তাঁর খেয়ালও ছিল, আঙুলে চক লেগে আছে, হাত ধোয়া হয়নি, তাই ডান হাতের আঙুল খাড়া থাকলেও ঠোঁটে লাগাননি। ছেলেমেয়েদের গলা করিডর থেকে স্বাভাবিকই শোনাচ্ছিল। খুব একটা মন না দিয়েও আন্দাজ হচ্ছিল—যদি তেমন কিছু নাটুকে ঘটে থাকে তা হলে ছেলেমেয়েরা চুপচাপ হয়ে যেত। যেটুকু আকস্মিকতা তা হয়ত ছিল তাঁর ক্লাশ শেষ করে দেয়ার ভঙ্গিটুকুতে। তাইবা কেন? তিনি ত এইভাবেই বরাবর ক্লাশ শেষ করে থাকেন। তাঁর আরম্ভ আর শেষে ত কোনো প্রস্তুতি বা সমাপ্তি থাকে না। এটা ত তিনি যৌবনে রপ্ত করেছিলেন, অধ্যাপনা জীবনের শুরুতে, বোধহয় সুশোভন সরকারের অনুকরণে। নাকি অধ্যাপক নির্মলকুমার বসুর? বা, হয়ত দুজনেরই নকলে। তারপর, সেটাই ত তাঁর স্বভাব হয়ে গেছে—তাঁর বলার ও লেখার। সমকালীনরা কেউ-কেউ ঠাট্টা করতেন—আমাদের মধ্যে একমাত্র সাহেব। ঠাট্টাটা আস্বাদ করতেন না সৌরাংশু, এমন নয়।

কিন্তু তাঁর বোধহয় এভাবে বসে থাকা ঠিক হচ্ছে না, মনে হচ্ছে, তিনি কিছু ভাবছেন।

সৌরাংশু চেয়ার ছেড়ে পেছনের বাথরুমে গিয়ে হাতটা সাবান দিয়ে ধুয়ে রুমালে মোছেন। সাবানটা তিনিই এনে দেন। বিশ্ববিদ্যালয়ের সাবান-তোয়ালে নাকি চুরি হয়ে যায়।

ঘরে ফিরে আবারও তিনি সন্তর্পণে চেয়ারে বসেন, এবার হেলান দিয়ে, বাঁ হাতটা হাতলে, ডানহাতটা টেবিলের ওপর ফেলে রেখে। টেবিলে ত আর কাগজের শেষ নেই, তারই কোনোটার ওপর ডানহাতটা পড়ে থাকে—যেন ঐ কাগজটা নিয়েই তিনি ভাবছেন।

অযথা ভাবনার একটা ভঙ্গি তাঁকে তৈরি করে তুলতে হচ্ছে কেন? সৌরাংশু কি কিছু লুকতে চাইছেন অন্যদের কাছ থেকে? বা, সৌরাংশু কি নিজের কাছে লুকতে চাইছেন যে তাঁর আত্মদ্বন্দ্ব প্রকাশ্যতায় এসে গেল? ছেলেমেয়েরা যদি বুঝেই থাকে

তিনি যুক্তির বিপর্যয়কে নানাভাবে এড়াতে-এড়াতে শুধু ছেলে-মেয়েদের জন্যে একটা যুক্তিকাঠামো খাড়া করলেন—তাতেই-বা কী? সৌরাংশু কি নিজের কোনো আত্মপ্রতিবিম্বকে বিকলতা থেকে রক্ষা করতে চাইছেন? তাঁর ছাত্রছাত্রীদের মধ্যে বড়জোড় দু-একজন হয়ত আন্দাজ করতে পারে যে যতটা বলবেন ভেবে-ছিলেন, ততটা বললেন না। কিন্তু তাও কি আন্দাজ করতে পারবে? তিনি ত শেষ পর্যন্ত 'রিডিং লিস্ট'ও দেবেন বলেছেন। তা হলে?

আর, যদি তাঁর সব ছেলেমেয়েই ধরে ফেলতে পারত, তারা যাঁর কথা ছাত্রছাত্রী-পরম্পরায় প্রবাদের মত শুনে এসেছে, এই বিশ্ববিদ্যালয়ের অর্থনীতি বিভাগের প্রতিপত্তি যাঁর বিদ্যা, কীর্তি ও ছাত্রদের ওপর নির্ভর করে এতদিন ধরে তৈরি হয়েছে সেই সৌরাংশু বস্তুত তাঁর নিজের ব্যক্তিত্বের গভীরে দ্বিখণ্ডিত হয়ে পড়ে আছেন তা হলে সেটা কি সৌরাংশুর পক্ষে আনন্দের ব্যাপার হয়ে ওঠাই উচিত ছিল না? দ্বিখণ্ডিত কেন? সৌরাংশু কি অসাবধানেও ইতিমধ্যেই ভাবতে শুরু করেছেন যে মার্ক্সবাদের যে-অন্তর্সংকট ঘটিয়েছে সমাজতন্ত্র তাতে তাঁর আস্তিক্য আর জ্ঞানতত্ত্ব আলাদা হয়ে গেছে? সৌরাংশু কি তাঁর আত্মরক্ষার যুক্তি তৈরি শুরু করে দিয়েছেন ইতিমধ্যেই, যেন তাঁর আস্তিক্য আর জ্ঞানতত্ত্ব পৃথক হয়ে গেলে তাদের অভেদত্ব ভেঙে যায় বটে কিন্তু তাদের স্বতন্ত্র সম্পূর্ণতা ব্যাহত হয় না?

বিশ্ববিদ্যালয়ের লম্বা-লম্বা স্টিলের ফ্রেমের কাচের জানলা-গুলিতে জমা ময়লা, রঙ, তৈলাক্ততার দিকে তাকিয়ে সৌরাংশুর অন্তত কয়েক হাজার বারের মত মনে পড়ে যায় যে এত সুন্দর পরিকল্পনার বাড়িতে এমন লম্বা জানলার কাচ একদিনও মোছা হল না, ধোয়া হল না, এমন কি, বাড়ির বাইরেটা রঙ করার সময় কাচের ওপর ছিটিয়ে যাওয়া রঙগুলোও কখনো তোলা হয়নি আর নতুন ধরনের এক আত্মকৌতুকে নিজেকেই তিনি ঠাট্টা করে উঠতে পারেন—কী যাদু মার্ক্সবাদী যুক্তিবিজ্ঞানের, নিজের সত্তার ধ্বংসকেও কেমন দ্বান্দ্বিকতায় সাজিয়ে নেয়া যায়! যে-র‍্যাশনা-লিজমের, যুক্তিবাদের বিরুদ্ধে দ্বন্দ্ববাদকে মার্ক্স ব্যবহার করলেন,

সমাজতন্ত্রের বিপর্যয়ের পর সেই দ্বন্দ্ববাদকেই সৌরাংশু যুক্তিবাদের সূত্র হিশেবে ব্যবহার করছেন, করতে শুরু করে দিয়েছেন? এমনই কি করা হয়েছিল সোভিয়েত ইউনিয়নেও, চীনেও?

সৌরাংশু তাঁর নতুন ধরনের আত্মকৌতুকে আর-একবার নিজেকে ঠাট্টা করে উঠতে পারেন—সোভিয়েত ইউনিয়নের বা চীনের মার্ক্সবাদ চর্চায় একটা ভুল বের করে দিতে পারলেই সৌরাংশু বেঁচে যেতে পারেন যেন! যেন, সোভিয়েত ইউনিয়ন বা চীন তাঁর সত্তার অংশ নয়? যেন, তাঁর আস্তিক্য আর তাঁর জ্ঞানতত্ত্ব তাঁর সত্তার অংশ নয়! যেন, তাঁর সত্তা ধ্বংস হলেও তাঁর আস্তিক্য আর তাঁর জ্ঞানতত্ত্ব বড়জোড় আলাদা হয়ে যায় কিন্তু অটুট থাকে। যেন সত্তার ধ্বংস মানে এক অবশেষহীন ভবিষ্যৎহীন নিরেট শূন্যতা নয়! নাকি, তেমন সত্তাই সৌরাংশুর গড়ে ওঠেনি যা ধ্বংসযোগ্য? যদি তাঁর সত্তা তাঁর জীবনের এতগুলো বছর ধরে গড়ে উঠে থাকে, ব্যাপ্ত হয়ে থাকে, নিহিত হয়ে থাকে, তা হলে ত তাঁর আজ ছাত্রছাত্রীর কাছে শুধু এই কথাটুকুই বলার ছিল—আমি তোমাদের যে-বিষয়ে বলছি সে-বিষয়ে আমি কিছু জানি না। কিন্তু সে-কথা উচ্চারণ পর্যন্ত যাওয়া ত অনেক দূরের কথা, সৌরাংশু যেন এখনো এই হিশেব কষতেই ব্যস্ত যে তাঁর ক্লাশে তিনি ধরা পড়ে যাননি ত? কী ধরা পড়া? কোন ধরা পড়া? কার কাছে ধরা পড়া? কার ধরা পড়া? এখন, বিশ্ববিদ্যালয়ের নিজের ঘরে বসে জানলা দিয়ে চৈত্রের রঙিন আকাশের দিকে তাকিয়ে সৌরাংশু কত সাবধানে তাঁর হাত ফেলে রাখেন টেবিলের ওপর—তাঁর ভাবনার একটা উপলক্ষের সংকেত রাখতে?

সৌরাংশুর ভিতরে তাঁর আজকের এই পড়ানোর বিষয়টারই অসম্পূর্ণতাটুকু লুকবার কি একটা উপলক্ষ দরকার হচ্ছে, এমন একান্তেও? টেকনোলজিকে জীবনের, সমাজজীবনের সর্বত্র এমন স্বীকার করে নেয়ার ফলেই কি সমাজতন্ত্রে বিপ্লবের এক পর্ব থেকে আর-এক পর্বে উত্তরণ হয়ে উঠল প্রাত্যহিক রুটিন, একঘেয়ে, অপ্রামাণিক। মাথাপিছু গড় আয়বৃদ্ধিতে ও এমন-কি আয়ু-বৃদ্ধিতেও সোভিয়েত ইউনিয়নে মাদকাশক্তি, আত্মহত্যা, মানসিক

ব্যাধি কমেনি। আবার, আর-একদিকে টেকনোলজিও ত তেমন সর্বব্যাপক হয়ে ওঠেনি সোভিয়েত ইউনিয়নে। সৌরাংশু নিজেই জানেন না তিনি কখন কোথায় কী উত্তর খুঁজছেন। সচেতন আত্মজিজ্ঞাসায় তিনি ত নিজেকেই প্রশ্ন করতে চান। আর বারবার সে-জিজ্ঞাসার জবাবে তিনি সোভিয়েত ব্যবস্থাকে বিশ্লেষণ করতে চান। বিজ্ঞানকে তত্ত্ববিশ্বের জায়গায় বসিয়েছিল এনলাইটেনমেন্ট। মার্ক্সবাদই 'বিজ্ঞানের যুগ'-এর অবসান ঘোষণা করে। অথচ নব্যবিজ্ঞানের নামে সমাজতন্ত্রে শুধু যে বিজ্ঞানের বিপরীত চর্চা প্রাধান্য পেল তা নয়, বিজ্ঞানকে ব্যবহার করা হল কমিউনিস্ট পার্টির নেতৃত্বের একটা দলকে ক্ষমতায় রাখার উদ্দেশ্যে মার্ক্সবাদী তত্ত্ববিশ্বের এক বানানো ছাঁচ তৈরির কাজে।

কিন্তু সৌরাংশু ত ইতিমধ্যেই তাঁর সারা জীবনে ঐ যুক্তিবাদের আশ্রয়ে নিজের যুক্তিবাদ তৈরি করে তুলেছেন। সোভিয়েতে, পার্টিতে বা রাষ্ট্রে যদি যুক্তিবাদকেই প্রশ্রয় দেয়া হয়ে থাকে আর বিজ্ঞানের বদলে বিজ্ঞানআচ্ছন্নতা, সায়েন্টিসিজমের, ভিত্তিই যদি তৈরি করা হয়ে থাকে, ত হয়েছে। তাতে পৃথিবীর আরো অজস্র বিপ্লবের মত আরো একটি বিপ্লবও না-হয় ব্যর্থ হয়ে গেল, যেমন মার্ক্স বলেছিলেন ১৮৪৮-এর প্রুশিয়ার বিপ্লব নিয়ে—তার আলো সেই তারাদের আলোর মতন যে তারা লক্ষ বছর আগে মরে গেছে, তার আলো সেই সমাজের শবদেহের আলো যে-সমাজ অনেক আগে পচে গেছে।

বুকের ভিতর কোথায় একটা মোচড় লাগে—সোভিয়েত সম্পর্কে নিজের মনে-মনেও এই কথাগুলি ভাবতে। কিন্তু এই সামগ্রিক বিপর্যয়ে সৌরাংশু ত নিজেকে কোনো একটা জায়গায় নির্দিষ্ট করতে চাইছেন, তাঁর স্থানাঙ্ক স্থির করতে চাইছেন। তাই সমাজতান্ত্রিক ব্যবস্থার ব্যর্থতা, সোভিয়েত ইউনিয়নের ব্যর্থতা ইত্যাদি দিয়ে তিনি সেই স্থানাঙ্ক মাপতে চান না। যদি সমাজতন্ত্রে পার্টিজানিজমকেই মার্ক্সবাদের জায়গায় এনে বসানো হয়ে থাকে, যদি সেখানে শিকড় গেড়ে বসা বাস্তবতাকে উৎরে নতুন মৌলিক মানবসম্ভাবনায় স্বর্ণগর্ভ এক ইতিহাস রচনার কাজে বিজ্ঞানকে ব্যবহার করা না হয়ে থাকে, সমাজব্যবস্থার নিয়তবদলের

পরিবর্তে সমাজব্যবস্থাকে রক্ষা করার কাজে যদি বিজ্ঞানকে ব্যবহার করা হয়ে থাকে অথচ বিজ্ঞানকেই তত্ত্ববিশ্বের জায়গায় বসিয়ে আজারবাইজানের মরুভূমিতে তুলো উৎপাদনের উৎসব সাজানো হয়ে থাকে তা হলে সৌরাংশু কী করবেন, কী করতে পারতেন? তিনি কি শুধু তাঁর সাইনবোর্ডটাকে পাল্টে দিয়ে বলতে পারেন—এতদিন যা চর্চা করেছি তাকে মার্ক্সবাদ বলে জানতাম কিন্তু আসলে সেটা প্রত্যক্ষতাবাদ, বা আরো ভাল বাংলায় সুবিধাবাদ? তা হলেই কি তাঁর পরিত্রাণ জুটতে পারে? তা হলে ত তাঁর মার্ক্সবাদের পাশে (গর্বাচভ-সংস্করণ) বা তাঁর সুবিধাবাদের আগে 'প্রাক্তন মার্ক্সবাদ' লিখলেই ব্যাপারটা চুকে যায়, তাঁর ব্যক্তিগত ব্যাপারটা।

সৌরাংশু তাঁর আত্মপীড়নকে আরো একটু মোচড় দিতে চান। প্রাক্তন মার্ক্সবাদ নয়, 'যা আগে মার্ক্সবাদ বলে পরিচিত ছিল,' 'ইনকরপোরেটিং হোয়াট ওয়াজ ওয়ানস কল্ড মার্ক্সিজম।'

কিন্তু সৌরাংশুর সেই ব্যক্তিগত স্বাধীনতা ত হেগেলের ফেনোমেনোলজির ক্রীতদাসের কাল্পনিক স্বাধীনতা। সৌরাংশুর মার্ক্সবাদচর্চা তাঁকে ত সেই কাল্পনিক স্বাধীনতা ভোগের অধিকার থেকেও বঞ্চিত রেখেছে। মার্ক্সবাদের দ্বান্দ্বিকতা ত ব্যক্তির যুক্তিবাদে শেষ হয় না, সে-দ্বান্দ্বিকতা সমগ্র সমাজের যুক্তিবাদের ভিতর সঞ্চারিত হয়ে যায়; সে-দ্বান্দ্বিকতা শুধু সামাজিক যুক্তিবাদ হিশেবে নিঃশেষ হয়ে যায় না, ব্যক্তির যুক্তিবাদ হিশেবে ভিত পায়; মার্ক্সের দ্বান্দ্বিকতা একটি বৃত্তাকার রুদ্ধ-গতিতে ত থেমে যায় না—সেই ব্যবস্থার সমস্ত কুটিলতাকে নিজের মধ্যে গ্রহণ করে; মার্ক্সের দ্বান্দ্বিকতা ত কর্মকে চিন্তার যুক্তিবাদে আটকে দেয় না, দেশকালে ব্যাপ্ত বাস্তব কঠিন কর্মের যুক্তিবাদকেও গতি দেয়—বাস্তব গতি।

তা হলে, সৌরাংশুর স্থানাঙ্ক কোথায়? মার্ক্সবাদ, সোভিয়েত ইউনিয়ন, সে সৌরাংশু, তার ব্যক্তিগত জ্ঞান ও আস্তিক্য—এই সব মিলে যদি একটা অখণ্ডক তৈরি করে না তুলত তা হলে ত এই প্রত্যেকটি উপাদানের যে-কোনো একটি ধ্বংস হয়ে গেলেও অন্য উপাদানগুলি বেঁচে যেত! এই সমগ্রতা যদি মার্ক্সবাদ তৈরি করে

দিয়ে থাকে, বা সোভিয়েত ইউনিয়ন তৈরি করে দিয়ে থাকে তা হলেও ত সৌরাংশু তা থেকে সরে দাঁড়াতে পারতেন! কার্টেজিয়ান যুক্তিবিন্যাসে সিদ্ধান্তের সার্বভৌমত্বের জন্যে প্রধান বাক্যের অধস্তনতা মেনে নেয়ার পদ্ধতি ধ্বংস করে মার্ক্সবাদী যুক্তিবিজ্ঞানে সার্বভৌমত্বের যে নতুন সংজ্ঞা প্রতিষ্ঠিত হল, তাতেই ত সৌরাংশু তাঁর ব্যক্তিগতকে, তাঁর বৃত্তিকে, তাঁর ব্রতকে, তাঁর বিশ্বাসকে আষ্টে-পৃষ্ঠে বেঁধে ফেলেছেন। মুক্তি নেই, সৌরাংশুর মুক্তি নেই! আঃ! মার্ক্সবাদ যদি আর-একটু কম সর্বগ্রাসী হত!

দুই

কোথাও কি কিছু শুশ্রূষা পেতে চাইছেন সৌরাংশু, যেমন চল্লিশ-পঞ্চাশ বছর আগে বেআইনি পার্টির হাইড-আউটে ?

জানলার দিকে তাকিয়ে ছিলেন সৌরাংশু। জানলার দেয়ালে আর কাচে ছায়া দুলে উঠতেই ডাইনে তাকিয়ে দেখেন যোগেন ঢুকছে, হাতে নানা সাইজের খাম, ইনল্যান্ড, বড় প্যাকেট। যোগেন সৌরাংশুর দিকে তাকায়ও না। সৌরাংশুর টেবিলের কিছুটা পরিষ্কার জায়গায় কতকগুলি খাম রেখে একটা পেপারওয়েট চাপা দেয়। বেরিয়ে যায়। পর্দাটা দুলে ওঠে। তারপর যোগেন দুলতে থাকা পর্দাটা সরিয়ে মুখ বাড়িয়ে জিজ্ঞাসা করে,'চা খাবেন নাকি ?' সৌরাংশু যোগেনের দিকে তাকান। কোনো জবাব দেন না। কিংবা কোনো জবাব ভাবার আগেই যোগেন পর্দা ফেলে দেয়। যোগেন যা জানতে চায়, তার জানা হয়ে গেছে। কিন্তু সে যে কী জানল তা সৌরাংশু আন্দাজ করতেও পারেন না। হতে পারে, যোগেন তাঁকে চা দেবে না। হতে পারে, যোগেন তাঁকে চা দেবে ও তাঁর এখানে তখন যদি অন্য কেউ থাকে তাঁকেও এক কাপ দেবে। চা পাওয়াটা এখানে সব সময় একটা সমস্যা, সেই জন্যে নানা সময় তার নানারকমের সমাধান খোঁজা হয়। কিন্তু যোগেন গেটের বাইরে কোনো গুমটি দোকান থেকে বোতলে করে দ্রুত চা নিয়ে আসতে পারে। শুধু তাদের বিভাগেই না, যোগেন এই তলায় ও এর ওপরের তলায় অনেক বিভাগেই চা দিয়ে থাকে। শোনা যায়, বাইরের দোকানটাও নাকি যোগেনেরই। যোগেনের মধ্যে একটা উদাসীন কর্মময়তা আছে। সব সময়ই এক গতিতে করিডর দিয়ে

হাঁটছে, সিঁড়ি দিয়ে উঠছে কিংবা নামছে, এ-বিভাগে যাচ্ছে, ও-বিভাগে যাচ্ছে, ছেলেমেয়েরা অনেক সময় নানা কথা নিয়ে যোগেনের পেছনে-পেছনে ঘোরে। কিন্তু নিজেই ঘুরুক আর তার পেছনে-পেছনে অন্যেরাই ঘুরুক, যোগেন কখনোই প্রায় কাউকে দাঁড়িয়ে জবাব দেয় না, বা দাঁড়িয়ে কারো কথা শোনে না। যোগেনের যাতায়াতের মধ্যে যোগেনকে কথাটা বলে দিতে হবে।

সৌরাংশু খামগুলোর একটা দিক ধরে বুড়ো আঙুলটা চালিয়ে দেন—কোনো ব্যক্তিগত চিঠি আছে কিনা দেখতে। একটা ইনল্যাণ্ড বের করে ফেলেছিলেন। তাঁর এক ছাত্র, কৃষ্ণপ্রিয়, চিনতে পারলেন না, এখান থেকে বি. এ. পাশ করে গৌহাটি বিশ্ববিদ্যালয় থেকে এম. এ. করেছে। মাঝখানে পারিবারিক কারণে পড়াশোনা বাদ দিয়ে চাকরিতে ঢোকে, রেলে। এখন বদরপুরে আছে—পরিবারসহ। কিন্তু তার চিরকালই পড়াশোনায় আগ্রহ। সে সৌরাংশুর কাছে পি. এইচ. ডি. করতে চায়। সৌরাংশু এই চিঠিটা আলাদা করে রাখেন—জবাব দেবেন। বাঁধা জবাব, কিন্তু তাঁর হাতের লেখায় ছেলেটা যদি জানতে পারে যে সৌরাংশু তাঁকে গৌহাটি বিশ্ববিদ্যালয়ের কারো কাছে এই কাজটি করার পরামর্শ দিচ্ছেন, তা হলে, খুশি হবে। আর-একটা লম্বা খাম ছিঁড়েই মন খারাপ হয়ে গেল সৌরাংশুর, ত্রিবান্দ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ের একটি ছেলের থিসিসের পরীক্ষক ছিলেন তিনি, তার ভাইবা নিতে যেতে হবে—এখনো মাস দেড়েক দেরি আছে। আর-একটা বড় খাম খুলে ভিতর থেকে একটা অফপ্রিণ্ট বের করেন, একটু নাড়িয়ে দেখেন সঙ্গে কিছু চিঠি আছে কি না। নেই। বিষয়টাতে একবার চোখ বোলান—তামিলনাড়ুর মূর্তিশিল্পের মেয়ে-শ্রমিকদের মজুরি ও এ-বিষয়ে তাদের বংশানুক্রমিক দক্ষতা। ওপরের সংক্ষেপণের লাইনকটিতে দেখেন—এই মেয়েরা এ-কাজ ছাড়া অন্য কোনো কাজে যায় না; সৌরাংশুর মনে চকিতে জিজ্ঞাসা জাগে—নাকি এই কাজটাতে এই মেয়েরা গেলেই কাজ পায়; আবার এই মেয়েদের ছাড়া এ কাজ চলে না, তবু, প্রকৃত মজুরি কমছে যদিও বিক্রি বাড়ছে। সৌরাংশু কাগজটা পাঁজার ওপর রেখে দেন। আর একটা বড় খাম খোলেন—'ইনকাম, আউটপুট অ্যাণ্ড এমপ্লয়মেণ্ট

লিঙ্কেজেস এ্যাজ ইমপোর্ট ইনটেনসিটিজ অব ম্যানুফ্যাকচারিং ইনডাসট্রিজ ইন ইণ্ডিয়া।' সৌরাংশু পাঁজার ওপর রেখে দেন, দেখবেন না। আর একটা মোটা খামের ভিতর থেকে একটা পত্রিকা বের করে সামনে রাখেন সৌরাংশু।

পর্দাটা সরানোই ছিল, তাতে আবার আলোছায়ার বদল হয়। সৌরাংশু চোখ তুলে দেখেন, শমিতা। শমিতা এইভাবেই ঢোকে, দরজায় একটু দাঁড়ায়, মুখটা একটু বাড়িয়ে দেখে ঘরে সৌরাংশু ব্যস্ত আছেন কি না, তারপর সৌরাংশু তার দিকে চোখ তুললে একটু হেসে ঘরে ঢোকে।

শমিতা সামনের সারির চেয়ারগুলোর পেছনে দাঁড়িয়ে থাকে, বসে না। সৌরাংশু বলেন, 'বসো'। শমিতা কোনো চেয়ার সরায় না, কিন্তু একটা চেয়ারের ফাঁক দিয়ে গলে আর-একটা চেয়ারে বসে —কোনো আওয়াজ না তুলে। সামনে কাগজপত্রের স্তূপে সৌরাংশু আর শমিতার ভিতর একটু আড়ালও হয়। এর সবটাই শমিতার স্বভাবের ভিতরের সৌজন্যের বাইরের ভঙ্গি। কাজ শেষ হলে, কখনো এক মিনিটও বেশি বসবে না। অথচ যদি বোঝে, স্যাররা একটু গল্পগুজবের মেজাজে আছেন, তা হলে স্মিতমুখে সেই আড্ডায় একটু যোগও দেয়।

শমিতাকে দেখে সৌরাংশু ঘড়ির দিকে তাকান—বারটা পাঁচ।

'তুমি কতক্ষণ এসেছ?'

'এই মিনিট দশেক স্যার।'

'তাই ভাবলাম, শমিতার লেট?

শমিতা একটু হেসে বলে, 'আপনি চিঠিপত্র দেখছিলেন, তাই ঘুরে গেলাম।'

সৌরাংশু মনে-মনে একটা হিশেব কষেন, তাহলে তিনি কতক্ষণ ক্লাশ নিয়েছেন? ক্লাশ থেকে বেরিয়ে চুপচাপ বসেছিলেন, তারপর ডাক দেখেছেন, তারপর শমিতা এসেছে। সব মিলিয়ে কি একঘণ্টা পর্যন্ত হতে পারে? তার চুপচাপ বসে থাকার সময়টার কোনো আন্দাজ ত এখন পাওয়া সম্ভব নয়। অমন দশমিনিট বসে থাকাকেও ত অনেক সময় অনেক দীর্ঘ মনে হয়। মাঝখানে উঠে ত বাথরুমে গিয়ে হাতও ধুয়ে এলেন। না, নিশ্চয়ই আধঘণ্টা

তিনি ক্লাশ নেননি। সব মিলিয়ে হয়ত মিনিট পনের আগে ছেড়েছেন ! তেমন হওয়ার সম্ভাবনাই বেশি। কারণ, তাঁর যা বলার ছিল তা ত তিনি বলেছেন। না, আসলে হয়ত সেখানেই সমস্যা। তাঁর যা বলার ছিল তা তিনি সব বলতে পারলেন না। তাই তাঁর মনে হচ্ছে, তিনি কিছুই বলেননি।

সামনের গ্লাসের ঢাকনাটা খুলে সৌরাংশু এক চুমুক জল খান। গ্লাসের ওপর আবার ঢাকনা দিয়ে শমিতার দিকে তাকিয়ে বলেন, 'নতুন কটা ইণ্টারভিয়ু করলে ?'

শমিতা তার কোলের ফাইলটার ওপর থেকে বাঁ হাতটা তুলে নেয়, এতক্ষণ দুটো হাতই ফাইলটার ওপর রেখে বসেছিল। একটা হাত তোলার অর্থ—এবার সে ফাইলটা সৌরাংশুকে দেবে। বরাবরই শমিতার প্রত্যেকটি ভঙ্গিই এমন অর্থময় যে শমিতা তার কথা বা কাজকে ভঙ্গি দিয়েই অনেকটা বোঝাতে পারে। তেমনি, ভঙ্গির অর্থও সে গভীরে বুঝে নিতে পারে। শমিতার মত এমন আরো দু-একজনকে সৌরাংশু দেখেছেন। এগুলো বোধহয় আসে বুদ্ধির তৎপরতা থেকে। আর, কিছুটা বোধহয় বংশানুক্রমিক। হয়ত শমিতার মা বা ঠাকুমার ধাতটা এ-রকম অথবা, শমিতার বাবাও এ-রকমই হতে পারেন, বা ঠাকুর্দা। এটাকে কি পারিবারিক কালচার বলা যায় ? সৌরাংশু ভেবে ফেলেন, তারও কি এ-রকমই স্বভাব ? যেন, মনে হয় তাই। শমিতার সঙ্গে তাঁর স্বভাবের এমন মিলের সম্ভাব্যতা আবিষ্কার করে সৌরাংশু যখন ফাইলটার জন্যে হাত বাড়িয়েছেন, তখনই শমিতা বলে ওঠে, এবার বাঁ হাতটাকে আবার ফাইলের ওপর নামিয়ে কিন্তু চেয়ারে নিজেকে সোজা করে, 'স্যার, আজ না-হয় থাক।'

সৌরাংশু তাঁর বাড়ানো হাতটা গুটিয়ে বলেন, 'কেন ? তোমার সব লেখা হয় নি ? যে-কটা হয়েছে সে-কটাই দাও-না।'

শমিতা ঘাড় নুইয়ে বলে, 'না স্যার, আমার সবগুলোই লেখা হয়ে গেছে,' ঘাড় তুলে সোজা তাকায় শমিতা, 'আপনাকে খুব ক্লান্ত দেখাচ্ছে, স্যার।'

সৌরাংশু ম্লান হাসেন, 'একটা ত মোটে ক্লাশ নিয়েছি—'

'হ্যাঁ, ছেলেমেয়েরা ত এখনো সে-কথাই বলাবলি করছে—'

'তাতেই ক্লান্ত লাগবে কী? আমি ত তোমাকে আজই আসতে বলেছিলাম?'

'হ্যাঁ, স্যার। আমি ওদের বললাম, স্যারের এ-রকম ক্লাশ শোনা সবসময়ই একটা ইভেণ্ট।'

'কাদের?'

'ওরা ত আপনার ক্লাশ শুনে নীচে সিঁড়িতে বসে আছে, লনেও, এত মুডড্', ঠোঁটে বাঁ হাত একটু চাপা দিয়ে ফিক করে হেসে ফেলে শমিতা বলে, 'দেখে মনে হল, সিনেমা দেখে বেরল।'

'সিনেমা?'

'হ্যাঁ—আ, একটা ভাল ফিল্মে স্যার কী রকম অপ্রত্যাশিত সব ঘটে যায় না? সে-রকম।'

'ফিল্ম কেন? ভাল কবিতার লাইনেও তাই, ভাল গল্প-উপন্যাসেও তাই। যতবারই পড়বে, ততবারই অপ্রত্যাশিতের ধাক্কা পাবে।'

একটু চুপ করে থেকে শমিতা বলে, 'হ্যাঁ—আ স্যার। ক্লাসিক্যাল গানেও ত এ-রকম হয়।'

'হ্যাঁ, ঠিক বলেছ, গানে ত খুব হয়, ঠুংরিতে না?'

'ভজনেও হয় স্যার, মীরার ভজনে—'

'কিন্তু সে ত কবিতাই—'

শমিতা একটু চুপ করে থেকে কিছু ভেবে বলে, 'রবীন্দ্রনাথের গানে, স্যার, কথারও হয়, সুরেরও হয়।'

সৌরাংশু একটু স্মৃতি হাতড়ে বলেন, 'হ্যাঁ—। হ্যাঁ'।

'কিন্তু ফিল্মেরটা স্যার নগদ-নগদ', হেসে ফেলে শমিতা, 'আসলে ইচ্ছে করলেও ত আর ফিল্মটা তক্ষুনি আবার দেখা যাবে না। সেইজন্যেই ফিল্মের কথা বললাম। ওরা ইচ্ছে করলেই ত আপনার ক্লাশটা এক্ষুনি আবার শুনতে পাবে না।'

'দাও', সৌরাংশু ডান হাত বাড়ান। তাঁর হাতে ফাইলটা দুই হাতেই তুলে দিতে-দিতে শমিতা বলে, 'এখনকার ছেলেমেয়েদের সঙ্গে আমাদের ঝগড়া হয় স্যার।'

নিজের সামনে ফাইলটা খুলতে-খুলতে, সেদিকে তাকিয়ে থেকেই সৌরাংশু বলেন, 'কিসের ঝগড়া?'

'সে একটা মজার ঝগড়া স্যার। আমরা বলি আপনি আমাদের সময় আরো ভাল পড়াতেন আর এরা বলে আপনি এখন আরো ভাল পড়ান।'

সৌরাংশু শমিতার কাগজগুলি পড়তে শুরু করেন। সৌরাংশুর পড়ার মধ্যে একটা পেশাদারি দক্ষতা আছে। খুব তাড়াতাড়ি পড়তে পারেন, প্রায় ডুবুরির মত লেখাটির মূল যুক্তির কাছে পেঁৗছে যান, পাতা ওল্টান একটু আওয়াজ করে, বোধহয় নিজের পড়ার গতি রাখতে।

কিন্তু শমিতার লেখাগুলো চোখের সামনে ধরে পড়তে-পড়তেও তাঁর মনে আসে—শমিতা কি কথায়-কথায় তাঁর মনের ক্লান্তি একটু দূর করে দিল, ক্লাশ থেকে বেরিয়ে বা ক্লাশ করতে-করতেই নিজের আস্তিক্য আর জ্ঞানতত্ত্বের দ্বন্দ্বের বদ্ধতা থেকে তাঁকে একটু মুক্ত করতে চাইল আপাত অপ্রাসঙ্গিক দৈনন্দিনের কথায়-কথায়? এ-রকম গল্প তাঁর শুনতে ইচ্ছা করছিলও—তাঁকে নিয়ে না হলে শমিতার সঙ্গে আর একটু গল্প করতেনও হয়ত।

অথবা, শমিতা তার অনুভবের ক্ষমতায় এতটাই স্বয়ংসম্পূর্ণ যে সে আপাতত সৌরাংশুকে আশ্বস্তই করতে চাইল, তিনি ক্লাশটা যথাযথই নিয়েছেন।

অথবা, শিক্ষক হিশেবে নিজের প্রতিষ্ঠায় এমনই অভ্যস্ত হয়ে গেছেন সৌরাংশু যে আজকের ক্লাশ নিয়ে তাঁর অনিশ্চয়তা শমিতার কথায় দূর হলে তিনি শমিতার অনুভবক্ষমতার স্বয়ংসম্পূর্ণতা নিয়ে চিন্তাভাবনায়, বা হয়ত কল্পনাতেই মাততে পারেন!

নিজের আস্তিক্য আর জ্ঞানতত্ত্বের ভগ্নঅদ্বৈতের মধ্যে কোথাও কি একটা শুশ্রূষা পেতে চাইছেন সৌরাংশু! সেই শুশ্রূষা তাঁর কাছে প্রয়োজনীয় ঠেকছে—যেমন ঠেকত আজ থেকে চল্লিশ-পঞ্চাশ বছর আগে পার্টির বেআইনি কাজে আত্মগোপনে থাকতে-থাকতে? যাকে 'শেলটার', 'হাইড-আউট', এই সব বলা হত, সেখানে আত্মগোপন করে থাকতে-থাকতে কত বয়স্ক নেতা হুট করে বিয়ে করে বসতেন। বাইরে থেকে কোনো খবর পাওয়া যাচ্ছে না, কোনো আন্দোলন নেই, বাড়ির খবর নেই, পাড়ার খবর নেই, পার্টিরও খবর নেই—সেই বিচ্ছিন্নতায় পার্টি বলতে ত মাঝেমধ্যে

সার্কুলার। সেই ভগ্নসমগ্রতায় কোনো এক মহিলার সঙ্গে একটু দেখাসাক্ষাৎ কথাবার্তা হল আর পঞ্চাশ বছর বয়সের কমরেড বিয়ে করে বসলেন। অনেকে আবার বিয়ের জন্যেই এক্সপেল্ড হতেন, আর এক্সপেল্ড হয়ে খুশিও হতেন। পরে তাঁরা পার্টিতে থেকেই গেছেন। কেউ-কেউ আবার বিয়ে পর্যন্ত যেতে সাহস করতেন না। কোনো-কোনো বয়স্ক নেতা কমবয়েসি কমরেডদের ওপর আবেগনির্ভর হয়ে উঠতেন। আজকাল হয়ত চট করে তাকে সমকামিতা বলে দেয়া হত কিন্তু সৌরাংশু বোঝেন, সেই নির্ভরতা ছিল ছোট ভাইয়ের ওপর বা ছেলের ওপর নির্ভরতার মত।

এখন ত আর-কোনো আত্মগোপন নেই, অন্তত সৌরাংশুর নেই। তিনি নিজেকে আজও কমিউনিস্ট আন্দোলনের কর্মীই ভাবেন। কিন্তু এখনকার কমিউনিস্ট আন্দোলন তাঁর মত কর্মীকে আন্দোলনের কর্মী হিশেবে গ্রহণ করতে পারে না। সৌরাংশু ত সি. পি. আই. নন, সি. পি. আই. এম. নন, নকশালদের কোনো দলেরও নন। এদের প্রত্যেকের সঙ্গেই তাঁর অনেক বিষয়ে মতৈক্য অনেক বিষয়ে মতানৈক্য, তার কোনোটাই ব্যক্তিগত নয়। পার্টি-গুলির সঙ্গে তাঁর সম্বন্ধ নিয়ে এক সময় নিজেই রসিকতা করতেন, বিলেতি-মার্কিন সেমিনারে শেখা বুলি কপচে রসিকতা করতেন, 'আমি একজন প্রাইভেট মার্ক্সিস্ট', 'বলতে পারেন নন প্র্যাকটিসিং মার্ক্সিস্ট, যেমন নন প্র্যাকটিসিং খ্রিস্চিয়ান বা মুসলিম', 'বিলিভিং মুসলিম বলে একটা ক্যাটিগরি খোমেইনির পর চালু হয়েছে, সেদিক থেকে বোধহয় আমিও বিলিভিং মার্ক্সিস্ট। অর্থাৎ আমি এতটাই মার্ক্সিস্ট যে শুধু মার্ক্সিস্ট বললে যার কুলয় না, আবার যোগ করতে হয় বিলিভিং মার্ক্সিস্ট', 'বিলিভিং মার্ক্সিস্ট কথাটার আর-একটি অর্থও অবিশ্যি হয়, এ লেজি আয়ডলার মার্ক্সিস্ট বা প্যারাসাইট মার্ক্সিস্ট বা আনপ্রফেশন্যাল, আনরিভলিউশনারি মার্ক্সিস্ট'।

কিন্তু এ-সব আর রসিকতাও নেই। এ-সব শব্দ তৈরি হয়েছিল সত্তরের দশকে পশ্চিম ইয়োরোপ আর আমেরিকায় মার্ক্সবাদ চর্চার গরম হাওয়ায়। সেই হাওয়ায় মার্ক্সবাদ কেমন শুধু একটা মেথড হয়ে উঠেছিল। সাসেক্সে একটা সেমিনারে দারুণ রসিকতা

করেছিলেন এই নিয়ে, মিলিবান্ড, সোস্যালিস্ট রেজিস্টারের সম্পাদক। লোকটাকে দেখতেও বক্সারের মত, কব্জি চওড়া আর রসিকতার সময় হাসলে একটু ভয়ই লাগে। বলেছিল, তোমরা ইয়োরো-আমেরিকান কমিউনিস্টরা মার্ক্সবাদকে একটা মেথড বা পদ্ধতিমাত্রে পরিণত করার জন্যে যেমন উঠেপড়ে লেগেছ তাতে এটা নিশ্চিন্তে বলা যায় যে সমাজতান্ত্রিক ব্যবস্থা ধ্বংস হয়ে যাওয়ার মত অসম্ভব ঘটনাও যদি ঘটে তাহলেও মার্ক্সবাদ অক্ষত থাকবে তোমাদের রচনায়, মার্ক্সের একশ বছর আর সোভিয়েত বিপ্লবের পঞ্চাশ বছরেরও পর অবশেষে মার্ক্সবাদের আসল অর্থ তোমরা আবিষ্কার করতে পেরেছ! আণবিক যুদ্ধে যদি পৃথিবী ধ্বংস হয়ে যায় আর শুধু তোমাদের বইগুলো থাকে—প্রতিটি পাঁচটি বইয়ের মধ্যে একটি মার্ক্সবাদ নিয়ে—তাহলে ভবিষ্যতের ঐতিহাসিকরা প্রমাণ করবেন সমাজতান্ত্রিক বিপ্লব আসলে ঘটেছিল পশ্চিম ইয়োরোপে ও মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে।

রসিকতা সত্য হয়ে যাওয়া কী ভয়ঙ্কর! সৌরাংশু যখন নিজেকে নিয়ে ঠাট্টা করতেন তখন তাঁর মেরুদণ্ডের শেষতম জায়গাটিতে গুঁড়ো-গুঁড়ো হাড় কচকচিয়ে উঠত একসঙ্গে একটিমাত্র জায়গায় হাজারটা সূচ ফুটিয়ে। দমদম জেলে তার গুহ্যদেশ দিয়ে পুলিশ ব্যাটন ঢোকাচ্ছিল। তবে এতবছর পরও ব্যথাটা একটা ছোট জায়গা ঘিরে বিদ্যুতের মত হানা দিয়ে মিলিয়ে যায় বলেই কপালের ঘাম মুছেও নিজেকে নিয়ে আরো একটা ঠাট্টায় যেতে পারতেন সৌরাংশু।

কিন্তু সত্য হয়ে ওঠা ছাড়া রসিকতার যখন আর-কোনো অর্থ থাকে না সে বড় ভয়ঙ্কর কাল। সেই ভয়ঙ্করতার ভিতর থেকে সৌরাংশু কি কাতরই হয়ে উঠছেন একটু শুশ্রূষার জন্যে? আর, সেও কি শমিতা, শমিতা বলেই?

তাঁর পঁয়ত্রিশ বছরের মাস্টারিতে শমিতা পনের বছরেরও বেশি সময় ধরে তাঁর ছাত্রী, তিনি অবসর নেয়ার পরও শমিতা ছাত্রীই থেকে যাবে। অনার্সের তিন বছর, এম.এ.-র দুই, চার বছরের মাথায় পি. এইচ. ডি.। বিয়ে হয়েছে, বোধহয় বাড়ি থেকেই। থিসিসের আগেই। বাচ্চা হয়েছে। সকালে একটি কলেজে পড়ায়।

কিন্তু এই সব কিছুর সঙ্গে-সঙ্গেই শমিতা এক-একটি বিষয় নিয়ে তার নিজের মত কাজ করে তৈরি হয়ে সব নিয়ে চলে আসত সৌরাংশুর কাছে। তাতেই সৌরাংশুর বিস্ময়—আরে, এর ত নিজেরই গরজে জিজ্ঞাসা জাগে। বিশ্ববিদ্যালয় থেকে বেরিয়ে যাওয়ার পরই যেন শমিতা আরো বেশি করে সৌরাংশুর ছাত্রী হয়ে গিয়েছে। এ-রকম আরো অনেকের বেলাতেই ঘটে, কিন্তু তারা ত তখন সৌরাংশুর সহকর্মী। এই বিশ্ববিদ্যালয়েই, বা, নয়ত অন্যত্র, কোনো কলেজে বা হয়ত পশ্চিমবঙ্গের অন্য কোনো বিশ্ববিদ্যালয়ে বা ভারতের অন্য কোথাও, এমনকি বিদেশেও—সৌরাংশুর কলিগ, সহকর্মী, তাদের সাফল্য নিয়ে সৌরাংশুর গর্ব আবার তাদের চিন্তার সঙ্গে সৌরাংশুর প্রতিযোগিতাও, শমিতা ত কখনোই তেমন হয়ে উঠল না, হয়ে উঠতে চাইল না। সে, একমাত্র সে-ই, ছাত্রী থেকে গেল। বা বলা যায়, সৌরাংশুকে অর্থনীতির মাস্টার রেখে দিল, পুরোপুরি তাত্ত্বিক হতে দিল না। হয়ত সৌরাংশুরই উৎসাহে দেশের ভিতরে কিছু-কিছু সেমিনারে গেছে। বিদেশেও যাবার কথা একবার উঠেছিল কিন্তু শমিতাই রাজি হয়নি—না স্যার, আমার শাশুড়ি খুব অসুস্থ, দু-চারদিনের জন্যে যাওয়া যায় কিন্তু টানা দশ-পনের দিন আমার পক্ষে বাইরে থাকা মুশকিল। শমিতার কাজগুলো অবিশ্যি জার্নালে বেরয় ও সেটুকুই সে চায়। কিন্তু এত যত্ন করে এতদিন ধরে সে এক-একটা সমস্যার অনেকখানি ভিতর পর্যন্ত দেখে যে কোনো-কোনো সময় সৌরাংশুর মনে হয়েছে, শমিতা যদি বিশ্ববিদ্যালয়ে বা অ্যাডভান্সড স্টাডি সেণ্টারে থাকত তা হলে আরো ব্যাপক জিজ্ঞাসার ভিতর ঢুকে যেতে পারত! সে-রকম একটা কাজ শমিতার হতেই পারত কিন্তু যখনই তেমন কোনো পদ বিজ্ঞাপিত হয়েছে ও সৌরাংশু জিজ্ঞাসা করেছেন শমিতা কি সেখানে যেতে যায়, শমিতা সব সময়ই স্বচ্ছন্দে বলেছে না স্যার, আমি পারব না স্যার, সকালের কলেজটাই আমার ঠিক, দুপুরটা আমাকে বাড়িতে থাকতেই হয়।

তবে সেই উচ্চাকাঙ্ক্ষাহীন অর্থনীতিগত জিজ্ঞাসায় শমিতা তার অভিজ্ঞতা থেকে উদ্ভূত প্রশ্নগুলিরই উত্তর খুঁজেছে। তার বাচ্চা হওয়ার পর সে কলকাতার পাঁচ হাসপাতাল ঘুরে তিন বছর

ধরে তথ্যসংগ্রহ করে যে কোন হাসপাতালে কোন এলাকা থেকে প্রসূতি বেশি আসে, জায়গা-অনুযায়ী প্রসূতিদের ক্যালরিগ্রহণের কোনো পার্থক্য আছে কিনা। তার জিজ্ঞাসার বিষয় ছিল শিল্পাঞ্চল ও কৃষিঅঞ্চলের প্রসূতিদের মধ্যে অপুষ্টির কোনো নির্দিষ্ট ধরণ আছে কিনা। আর-একটা কাজ সে করেছিল—মেয়েসন্তান কম পুষ্টি পায় কিনা। এটা অবিশ্যি সে দেখেছিল প্রধানত কলেজের মেয়েদের ভিতর। সে-সময় উইমেন স্টাডিজ সবে শুরু হয়েছে। এটা প্রায় তখন প্রতিষ্ঠিতই হয়ে গেছে যে বাড়ির মেয়েবাচ্চারা ছেলেদের চাইতে কম পুষ্টি পায়। শমিতা তার কাজে এটা দেখায় যে শহরে, ও মাসিক এমন-কি দেড় হাজার টাকা আয়ের সংসারেও মেয়েরা কম পুষ্টি পায় না, যদি পরিবারে বাচ্চার সংখ্যা দুই-তিনের বেশি না থাকে! বাচ্চার সংখ্যা তার বেশি হলে পুরুষ বাচ্চাও কম পুষ্টি পায়। শমিতা দেখিয়েছিল —এটা নির্ভর করে পরিবারের স্বাস্থ্যসচেতনতার ওপর। শহরে এটা অনেক বেড়েছে। হয়ত গ্রামেও বেড়েছে কিন্তু গ্রাম থেকে কোনো তথ্য সে যোগাড় করেনি। সৌরাংশু তাকে বলেছিলেন, তুমি যখন এতটাই করলে তখন দুই-একটা গ্রামের স্যাম্পলিঙও নাও-না। কিন্তু শমিতা যেমন কথা বলার সময় স্বর বেশি ওঠায় না বা নামায় না তেমনি স্বরে বলেছিল, সে স্যার আমি পারব না। সৌরাংশু তার কথার মানেটা ধরতে না পেরে যখন জোর করেন, শমিতা বলে, আমি স্যার বাড়ি সামলে অতটা করতে পারব না। এ-রকম করেই ধীরে-ধীরে শমিতা একটা স্বয়ংসম্পূর্ণতার বোধ জাগায়—নিজের সীমা জেনে ও মেনে যে-স্বয়ংসম্পূর্ণতা গড়ে ওঠে, কিন্তু যে-স্বয়ংসম্পূর্ণতা কখনোই বেড়ে ওঠা বা গড়ে ওঠা থামায় না।

শমিতার এখনকার বিষয়টাও তার দৈনন্দিন চলাফেরা থেকেই এমন একটা জিজ্ঞাসায় পরিণত হয়েছে।

তার শ্বশুরবাড়ি যোধপুর পার্কের উত্তর দিকে বাজারের পেছনে। কলেজে যাতায়াতের জন্যে তাকে রাস্তা ছোট করতে ঢাকুরিয়া রেললাইনের পাশ দিয়ে যাতায়াত করতে হয়। যোধপুর পার্ক স্টপে নেমে রিক্সায় আসাযাওয়ার যাইতে এই পথে হাঁটাহাঁটি

তার পক্ষে সুবিধেজনক। রেললাইনের পাশে, রেললাইনের গা ঘেঁষে রেলের জমিতে যে কলোনি গড়ে উঠেছে, এই হাঁটাহাঁটির সূত্রেই তার সঙ্গে শমিতার পরিচয়। এমন দৈনন্দিন যাতায়াতে পরিচয় যে একটা গড়ে ওঠেই, তা নয়। বরং যেন পথ সংক্ষেপণের বাধ্যতায় এমন একটা জায়গা কোনো রকমে পার হয়ে যাওয়াটাই অভ্যেস হয়ে আসে।

কিন্তু শমিতা এত দিন ধরে যাতায়াত করা সত্ত্বেও দৈনন্দিন দৃশ্যও ভুলে যেতে পারে না। ট্রেন আসছে-যাচ্ছে যেখানে, সেখানে রেললাইনের মাঝখানেই বাচ্চাদের খেলাধুলো, আর ট্রেন আসছে বুঝে সেখান থেকে বাচ্চাদের ছুটে পালিয়ে আসা; এই সরল অথচ বিপরীতমুখী ঝঙ্কাররণিত গতির মধ্যেই মেয়েদের ছুটে-ছুটে দুই পথের দুটো ডবল লাইনের মাঝখানে খালি ফালিটাতে কাপড়চোপড় শুকতে দেয়া, গুল (কোলবল) ও ঘুঁটে বানিয়ে শুকতে দেয়া, কোথাও-কোথাও আঠাসাঁটা প্লাইউড শুকতে দেয়া বা তুলে আনা; এমন ছুটন্ত মারাত্মক ট্রেনের লাইনের মধ্যে দৈনন্দিন জীবনের বিস্তার যেন ট্রেন বলে কিছু নেই, রেললাইন বলেও কিছু নেই; ও মাত্র কয়েক সেকেণ্ডের অমনোযোগিতায় অনিবার্য মৃত্যুর আশঙ্কাও সেখানে নেই—জীবনের এই তীব্র নাটকীয় অথচ শান্ত স্থির প্রবাহের বৈপরীত্যে শমিতা অভ্যস্ত হয়ে ওঠে না। এ যেন জ্যান্ত আগ্নেয়গিরির গায়ে কাপড় শুকতে দেয়া বা তার জ্বালামুখ ঘিরে শিশুদের হাত ধরাধরি খেলা। শমিতা এটা হয়ত আন্দাজ করতে পারে যে তার কাছে দর্শক হিশেবে এই জীবনযাপনের যে-আতঙ্কটাই প্রধান, যারা জীবনটা যাপন করছে তাদের কাছে সে-আতঙ্কটা কখনোই প্রধান হতে পারে না, হলে তারা বাঁচতে পারত না কিন্তু জীবনযাপনের নানা ধরণ ও রকমফেরের প্রকৃতি বোঝার চেষ্টায় অর্থনীতির ছাত্রী হিশেবে এটাও সে আন্দাজ করতে পারে যে এই জীবনযাপনের কোথাও মৃত্যুর এত ঘনিষ্ঠ হয়ে বাঁচার বাধ্যতাও আছে—সম্ভবত, বা হয়ত নিশ্চয়ই, এরা মৃত্যুর নিশ্চয়তার ভিতর থেকে সরে আসার জায়গা হিশেবেই রেললাইনের পাশের বা মাঝের জায়গাটা বেছেছে। এখানে অন্তত দুটো ট্রেনের যাতায়াতের মাঝখানে

কয়েক মিনিটের ব্যবধান থাকে, এখানে অন্তত চব্বিশঘণ্টার ভিতরে দুপুর-রাতের কয়েকটি ঘণ্টা ট্রেন কম যাতায়াত করে বা একেবারেই করে না ও এখানে অন্তত জীবিকার অনিশ্চয়তাটাও একটা হিশেবের মধ্যে আনা যায়। তাতে যে মৃত্যু এড়ানো যায়, সব সময় তা নয়। শিশুর স্বভাবই এই সে যখন যা করে তাতেই সমর্পিতসত্তা। বাচ্চা যে উদাসীন মগ্নতায় মায়ের দুধ খায়, সেই মগ্ন ঔদাসীন্যেই খেলে যায়, খেলে যায়। রেলের ইস্পাতে-ইস্পাতে ট্রেনের চাকার ঘর্ষণের ধ্বনি হয়ত এই সব বাচ্চা প্রায় জন্ম থেকেই পেতে পারে—তাকে নিয়ে তার মায়ের গর্ভও ত এই ট্রেনের গতিতেই অহোরাত্রি অহোরাত্রি অহোরাত্রি কেঁপে-কেঁপে গেছে। তবু, খেলা ত খেলাই, খেলার আকাশ ত চির অন্তহীন। সেই খেলায় ত একটি শিশুর কয়েক সেকেণ্ডের বিভ্রম ঘটতেই পারে, তারা ত এই খেলাও খেলে যে দুই লাইনের ওপর দিয়ে বিধ্বংসী ট্রেন ছুটে গেলেও দুই লাইনের মধ্যবর্তী তাদের খেলার সংসার কেমন অটুট থাকে। সেই ধ্বংসহীন খেলার সংসার সাজাতে শেষ মুহূর্তের একটু এদিক-ওদিক ত হতেই পারে আর এই শিশু তার খেলার সংসার থেকে মাত্র বিঘত দেড়েক খাড়া। সেই বিঘত দেড়েকের প্রতিরোধ ভেঙে গুঁড়িয়ে দিতে কত মেগাওয়াট বিদ্যুৎচালিত রেল-ইঞ্জিন দরকার? এমনও হয়েছে, ট্রেনের লোহার আঘাতে ঐটুকু শরীর এত ছিন্নভিন্ন হয়ে গেছে যে সৎকারের জন্যে শরীরটাকে পুনর্গঠন করা যায়নি। এমনও হয়েছে, একটা বাচ্চার এমন ছিন্ন-ভিন্ন হয়ে যাওয়া কারো খেয়ালেও আসেনি, ট্রেন চলে গেলে তার সঙ্গী খেলুড়েরা খেলায় ফিরে গেছে, তারপর আরো অনেক ট্রেন চলে গেলে সেই মায়ের নজরে পড়েছে তার বাচ্চা নেই। হা-হা-কা-র ডোবানো ট্রেনের ছুটন্ত আওয়াজের ভিতর ছুটে-ছুটে-ছুটে-ছুটে বাচ্চার মৃতদেহের টুকরো কুড়তে হয়েছে আর কুড়তে-কুড়তেও আত্মরক্ষার জন্যে শবকুড়ুনিদের ট্রেনের লাইন ছেড়ে দিয়ে দাঁড়িয়ে ট্রেন যেতে দিয়ে আবার সেই লাইনে সমবেত হতে হয়।

বা, এমনও হয় যে কোনো বুড়ি হঠাৎ বিস্মরণে মাঝখানের ফাঁকাটাকে তার বাড়ির আঙিনা ভেবে বসে। বা, হয়ত গ্রামের মাঠ ভেবে বসে। একভাবে মাথা নুইয়ে, একই রোদের তাপ আর

বাতাসের বেগ শরীরময় নিতে-নিতে, একই স্বগতোক্তিতে ব্যস্ত থাকতে-থাকতে, একই খালি পেটে খিদে সইতে-সইতে, হঠাৎ কাজ ছেড়ে কোমর বেঁকিয়ে উঠে দাঁড়ালে বুড়ির মনে হতে পারে সে এবার গ্রামের মাঠ থেকে তার বাড়িতে ফিরবে। সে আপন মনে বকবক করতে-করতে রেললাইন পেরতে যায় ঠিকঠাক এখনকার অভ্যেসে আর ট্রেনের অবধারিত গতি ভুলে যায় প্রাচীন অভ্যেসে। গ্রামের মাঠ দিয়ে ত আর ট্রেন আসে না। এমন বিভ্রান্ত শবদেহও ছড়িয়ে-ছিটিয়ে থাকে চেতনাসম্পন্ন সম্পূর্ণ মানুষের শরীরের মতই।

শমিতা তার জিজ্ঞাসার উত্তর খুঁজে-খুঁজে দৈনন্দিন যাতায়াতের অঙ্গাঙ্গী এই প্রশ্নগুলি থেকে অপরিচয়ের বিস্ময় ঘুচিয়ে দিতে চেয়েছিল। 'স্যার, আমি শুধু ঘুরে-ঘুরে জেনে নেব, এঁরা কে কোথা থেকে এসেছেন, কেন এসেছেন, এখানে কী করেন—আর-কিছু নয়। তাতে হয়ত জানা যাবে—গ্রামে এঁদের জীবনের অনিশ্চয়তা কোথায় ছিল আর এখানে সেটা দূর হয়েছে কোথায়।'

শমিতা নিজের মতই ঘুরে-ঘুরে এই প্রশ্নগুলির জবাব খুঁজতে-খুঁজতে আরো কত নতুন প্রশ্ন তৈরি করে ফেলেছে, জেনে গেছে ট্রেন, ট্রেন আর ট্রেন, লাইন, লাইন আর লাইনের ভিতর কোথায় কী ভাবে ঘুরতে হয়, জেনে গেছে এই কলোনি রেললাইন ধরে পুবে-পশ্চিমে কতটা এগিয়েছে। এই কাজটায় শমিতা শুরুতে যে-সীমা ছকে নিয়েছিল সেটাকে নিজেই বারবার বদলেছে, যে-প্রশ্নগুলি সে ঠিক করেছিল সেগুলো বারবার বদলেছে, তার প্রথম প্রশ্নগুলির জবাব যারা দিয়েছিল তাদের কাছে ফিরে-ফিরে গেছে পরের প্রশ্নগুলির জবাব জানতে। এই প্রক্রিয়ায় তার সঙ্গে এক ধরণের সম্পর্কও তৈরি হয়ে গেছে। এখন আর এই কলোনিটা একটা জনবসতিমাত্র নয়। এদের বাড়িঘর কেমন, কে কতটুকু জায়গা নিয়ে থাকে, কে কী কাজ করে তার খানিকটা সে জানে, অনেকটা সে আন্দাজ করতে পারে। এখন আর তার কাছে দুর্বোধ্য নয়—কেন এমন কলোনির এই একই রকম ঝুপড়ির মধ্যে কতকগুলি ঘরের মেঝে থেকে একহাত-দেড়হাত ওপর পর্যন্ত বাঁধানো, কেন দু-একটা বাড়িতে টিনও উঠেছে—পিচ-মবিলের পেটানো টিন, কেন দু-একটা

বাড়িতে একটু কাঠও লাগানো হয়েছে।

শমিতার কাগজ বেড়েই চলে।

অনেক দিন পর সৌরাংশু বলেছিলেন, তোমার যা তথ্য জমেছে তাতে ত তোমাকে তোমার জিজ্ঞাসার চৌহদ্দিও বাড়াতে হবে। এটা ত অংশত হয়ে যাচ্ছে কলকাতা শহরে শ্রমের সামাজিক চেহারার একটা মানচিত্র; কলকাতা, মানে মহানগর কলকাতার বিচিত্র জীবনই ত এদের কাছে প্রধান টান—নইলে তারা এখানে আসবে কেন; জীবিকার কোনো স্থিরতা না থাকলেও জীবিকা থেকে জীবিকায় চলে যাবার একটা ধাক্কা কলকাতায় আছে—রাজমিস্ত্রির শাগরেদের কাজ করে যে, সে আবার ক্যাটারারের ঠাকুরের শাগরেদের কাজও করে, মানে পেয়ে যায়; যে ডেকরেটরের বাঁশের কাজ করে, সে আবার কর্পোরেশনের পয়সা দিয়ে গাড়ি পার্কিঙের রাস্তাতে কনট্রাক্টারের সাব-কনট্রাক্টারের অ্যাসিস্ট্যান্ট হয়ে খাটে; আমি ত এ-সব কিছুই জানি না—তোমার ইন্টারভিয়ুগুলো থেকেই জেনেছি; আবার দেখছি—এর মধ্যেই কোনো-কোনো কাজ কোনো-কোনো মাসে বেশি হয়, কোনো-কোনো মাসে হয় না, আবার কিছু-কিছু কাজে কেউ-কেউ দক্ষ হয়ে ওঠে; এ-সবই ত কলকাতার জীবনযাত্রা যে-শ্রমের ওপর নির্ভরশীল তারই নানা সামাজিক রূপ।

শমিতা চুপচাপ শুনেছিল ও শোনার পরও চুপচাপ ছিল। সেটাই ওর ভঙ্গি। সম্মতি বা স্বীকৃতির নয়, কাজটা মেনে নেয়ার। করার পর সে তার সম্মতি বা স্বীকৃতি জানায়। শমিতার এই ভঙ্গিটাকে, গ্রহণ, বলা যেতে পারে বড়জোর। তার এই গ্রহণ কখনোই শুরু হয় না যদি সে কাজটার নিজস্বতার যুক্তিতে এই প্রস্তাব মেনে নেয়। তার প্রত্যেকটি কাজই স্বয়ংসম্পূর্ণ কিন্তু কাজের যুক্তিতে নয়, এমন-কি তথ্যের যুক্তিতেও নয়। তার জিজ্ঞাসার উৎস, অনুভব। সেই অনুভবে যদি সে বোঝে জিজ্ঞাসা ক্রমব্যাপ্ত হয়ে যাচ্ছে, বাধা দেয় না। কিন্তু সেই অনুভবে যদি সে বোঝে তার জিজ্ঞাসার স্বাধীনতা ক্ষুণ্ণ হচ্ছে, তা হলে সে-জিজ্ঞাসায় সাড়া দেয় না। অনুভব—চিলের পাখায় শূন্যতার অনুভব, মাছের শুঁড়ে গভীরতার অনুভব। আর, হয়ত নারীপশুর ঋতুকালে পুরুষের জন্যে অনুভব, কালহীন ঋতুময়তায় মানবপুরুষের জন্যে

মানবনারীর অনুভব। সেই অনুভবের ক্ষমতা শমিতাকে জ্ঞানের এক অন্য পদ্ধতির কাছে পৌঁছে দিয়েছে, যাকে এরিস্টটল বলে ছিলেন, ততটা জ্ঞানগম্য নয় যতটা সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম অনুভববেদ্য।

কথাটাকে এ-রকম ভাগ করতে চান না সৌরাংশু, এমন সিদ্ধান্ত-মূলক ভাগ—সৌরাংশুর আস্তিক্য আর জ্ঞানতত্ত্ব যেমন এক অভেদ, শমিতার অনুভব আর জ্ঞানতত্ত্ব তেমনি এক অদ্বৈত। এমন টুকরো-টুকরো করে ভাবনায় সমগ্রতা হারিয়ে যায়, হারিয়ে গেছে। তার মানে কি শমিতার অনুভব সৌরাংশুর আস্তিক্যের বিরোধী? নাকি, তার মানে সৌরাংশুর আস্তিক্যে শমিতার অনুভবের একটা বিকল্প আছে? নেই, নেই, নেই। এই মুহূর্তে সৌরাংশুর সারা জীবন ধরে লালিত আস্তিক্য বিধ্বস্ত হয়ে গেছে। কিন্তু তৎ সত্ত্বেও জ্ঞানতত্ত্ব আছে। তাহলে সৌরাংশু কি আস্তিক্যহীন জ্ঞানতত্ত্বকেই তার অবলম্বন হিশেবে মেনে নেবেন? নাকি শমিতার অনুভব তাঁর আস্তিক্যকে কোনো শুশ্রূষা দিতে পারে? সেই অনুভব, মার্কস যাকে বলেছিলেন, ১৮৪৪-এর পাণ্ডুলিপিতে মানুষের কাছে মানুষের প্রত্যাবর্তন।

সৌরাংশু পড়ছিলেন—শমিতা তার সংগৃহীত যে-তথ্যগুলি জোগাড় করে এনে টেপ থেকে তুলে তাঁকে সাজিয়ে দিয়েছে।

'আমাদের দেশটা যে পরাধীন ছিল, তা জানেন?'

'পরাধীন? সে ত থাকে। আমাকে যদি ছাড়িয়ে দেয় তাহলে ত আমাকে নতুন বাড়ি ঠিক করে নিতে হবে।'

'আমি আপনার পরাধীনতার কথা বলছি না। আমাদের দেশ, এই দেশটা যে পরাধীন ছিল, তা জানেন ত?'

'তা ত ছিলই। আমার শ্বশুরের ছিল দশবিঘে ভাগচাষ আর নিজের হালবলদ। তা শুনেছি, ভালই চলত সংসার। কিন্তু শ্বশুরঠাকুরের ত মা ষষ্ঠীর কৃপায় চার ছেলে। আমার স্বামীই ছোট। তাদের আবার দুটো-চারটে করে কচিকাচা হয়েছে। কিন্তু পেট বাড়লে ত আর ভাত বাড়ে না। হাত বাড়লেও ত আর কাজ বাড়ে না। দুজনের কাজ দশজন করলে হাতের খিলও ভাঙে না, পেটের খিলও ভাঙেনা।'

'তখন কি আমরা পরাধীন ছিলাম ?'

'পরাধীন না ? বলেন কী ? হাতের পরাধীন পেট, পেটের পরাধীন জীবন। এও যদি পরাধীন না হয়, তা হলে আর পরাধীন বলে কাকে ?'

'সে ত বটেই। কিন্তু আমি ত দেশের কথা বলছি। তখন কি আমাদের দেশে দেশের লোকরাই রাজা, নাকি সাহেবরাই রাজা।'

'যারা রাজা হয়, তারাই ত সাহেব।'

'তা ত হয়, কিন্তু দেশী সাহেব, না বিদেশী সাহেব ?'

'সাহেব হল সাহেব। সাহেবদের আবার দেশ হয় নাকি ? সে আমি বলতে পারব না দিদি, তবে আমাদের এক মুসলমান পড়শির সঙ্গে আমরা এখানে চলে এলাম। সেই বলল, দেশগাঁওয়ের যে-ভাব তাতে দেশে থেকে কিছু হবে না। হ্যাঁ দিদি, ঐ একবার দেশের কথা হয়েছিল। বলল—কলকাতায় দুজন মিলে স্বামী-স্ত্রী খেটে-খুটে বাঁচতে পারবে, ছেলেপিলেগুলোকেও বাঁচাতে পারবে।'

'এই কলকাতাটাও ত আমাদের দেশ ?'

'সে জানি নে গো দিদি। ঐ দেশে হাতে কাজ ছিল না, পেটে ভাত ছিল না। এই দেশে এখন হাতে কাজ আছে, পেটে ভাত আছে। যদি বলেন এক দেশ ত এক দেশ। তবে আমার কাজই প্রথমে হয়েছিল।'

'আপনার স্বামীর কোথায় কাজ হল ?'

'প্রথম কাজ ত আটদিনের বেশি টিকল না।'

'কবে মথুরাপুর থেকে এসেছেন, কিছু বলতে পারেন ?'

'সে দিদি অনেক দিনই এসেছি। তখন এত ভিড় ছিল না এখেনে।'

'কত আগে কিছু আন্দাজ নেই ? তখন কি আমাদের প্রধানমন্ত্রী ইন্দিরা গান্ধী ?'

'ইন্দিরা গান্ধী ত জানি। কিন্তু আর কী বললেন ?'

'প্রধানমন্ত্রী ?'

'সে-সব জানি না।'

'এখানে এসে ভোট দেননি ?'

'সে ত একবার আমাদের গৃহবাবু নিয়ে গিয়েছিলেন।'

'কাকে দিয়েছিলেন ভোট ?'

'গুহবাবু একটা কাগজ দিয়েছিলেন। সেই কাগজ নিয়ে ভোট দিয়ে এলাম।'

'সিল মেরেছিলেন ত ?'

'কী জানি, কী মেরেছিলাম !'

'কোন চিহ্নে ভোট দিয়েছিলেন ?'

'ওরাই ত আঙুলে চিহ্ন দিয়ে দিল।'

'আচ্ছা, আপনার সবচেয়ে পুরনো কথা কী মনে পড়ে ? বিয়ের আগে বাপের বাড়ির কথা ?'

'যখন যেখানে থাকি তখন সেখানকার কথা মনে পড়ে। এখন এখানে থাকি, এখন এখানকার কথা মনে পড়ে।'

'বাপের বাড়িতে পেট ভরা খেতে পেতেন, নাকি, শ্বশুর বাড়িতে ?'

'পেটের ত আর মাপ জানি না, কী করে বলব কতটায় পেট ভরে ?'

'এখন পেট ভরে খান না ?'

'যে-সব বাড়িতে ঠিকে করি, তারা কাজেকম্মে খেতে বলে। ঐ টেবিলচেয়ারেই। তবে ক্যাটারারের খাওয়া ত, বেশি দেয় না, এঁটোকাঁটাও থাকে না।'

'আগে খেয়েছেন, এঁটোকাঁটা, বিয়ে বাড়িতে ? মানে, যে-বাড়িতে কাজ করেন—'

'তা দিদি, ঠিকে হলে কী হয়। কাজের বাড়িতে কাজকম্ম লাগলে আমাদেরও ত বাড়তি কাজ করতে হয়, বাড়ির মাসিরা হাত খুলেই দেয়, দিদি।'

'তার কি কোনো রেট আছে ?'

'রেট না থাকলে কাজ হয় দিদি ? দুই ঘর ডাইনিঙের এক রেট, বাড়িতে কলেজে পড়া মেয়ে থাকলে জামাকাপড় কাচার আলাদা রেট।'

'সে-সব ত জানিই। আমি বলছি, বিয়েবাড়ির কাজের।'

'আমি কি ক্যাটারারের কাজ করি ?'

'না, না, যে বাড়িতে ঠিকে করেন, তাদের কাজকম্মে ত খাটতে

হয় বেশি—'

'সে ত একটু খাটতে হয়ই, সে ত বাড়ির কাজই ধরেন।'

'হ্যাঁ। তার জন্যে কি আলাদা রেট?'

'যেমন কাজ তেমনি রেট। রেট ছাড়া কি কাজ হয়?'

'কী রেট? বিয়েবাড়ির কাজের?'

'সে ত ক্যাটারারের রেট। আমি ক্যাটারারের কাজ করি না।'

'এখন আপনাদের খাওয়াদাওয়ার কোনো অসুবিধে নেই?'

'সন্ধ্যাবেলা রান্না চড়াই, সেই বাসিই সকালে বাচ্চাকাচ্চারা খেয়ে নেয়।'

'তা হলে আপনার ঘরে দুবেলা খাওয়া হয়, এখন?'

'দুবেলা আর পারি কোথায় দিদি? আমি কাজে-কাজে থাকি। আমার স্বামী ত কাজের জায়গায় টিফিন করে। ঐ সন্ধেবেলায় একবেলা।'

'সন্ধেবেলায় ত রান্না করেন। কিন্তু খান ক বেলা?'

'বেলা গুনে কি আর খাওয়া গোনা যায় দিদি? ঐ একবেলা রান্না, একবেলা খাওয়া।'

'সকালে আপনি চা খান?'

'আমি গিয়ে বেল বাজালে ১৩০ বাড়ির বৌদি ঘুম থেকে ওঠে। দরজা খুলে দিয়ে বৌদি বাথরুমে যায় আর আমি চায়ের জল চাপাই। বৌদি বাথরুম থেকে বেরিয়ে দাদাবাবুর চা নিয়ে যায়। পাঁচ বছর বিয়ে হয়েছে। বাচ্চা হয়নি। ডাক্তার দেখায়। বোধহয় দাদাবাবুরই দোষ। ঐখানে চা-রুটি খাই। আর-এক বাড়িতেও চা খাই, রুটিটা খাই না, নিয়ে আসি ৩০২-এ।'

'সেটা কটার সময়?'

'ওখানে ত কাপড়ধোয়ার কাজ। মিনতির মা-ই করত আগে। কিন্তু বয়েস হয়েছে ত, আর পেরে ওঠে না! আমাকে বলল, তুই যদি কাপড়কাচাটা করে দিস, আমি বাসনমাজাটা রাখি।'

'সেটা কটার সময়?'

'দাদা-বৌদি দুজনেই ত চাকরিতে যায়, মাসিমা একা থাকে। তখন মাসিমা এক কাপ চা খায় আর আমি এক কাপ চা খাই!'

'চা কি কলকাতায় এসে খাওয়া শিখেছেন, নাকি মথুরাপুরেও

খেতেন ?'

'চা খেতে ত মিষ্টি লাগে।

'মথুরাপুরের চা কি মিষ্টি না ?'

'মিষ্টি না দিলে কি চা হয় ? ৩০২-এর মাসিমার সুগার, চায়ে মিষ্টি খায় না, স্যাকারিন, এক ফোঁটা।'

'আচ্ছা আপনারা যখন এখানে আসেন, তখন ত এই ব্রিজ হয়ে গেছে, ঢাকুরিয়া ব্রিজ ?'

'ওদিকে আর যাওয়া হয় না দিদি, আমার কাজ ত এদিকে, যোধপুরে। ও ত রোজ যায় ঐদিকে। ও সব জানে, ঐ ব্রিজ-ট্রিজ সব। কবে কী হল।'

'আপনারা সিনেমায় যান না ?'

'গুরুদক্ষিণা। টিভিতে দেখায়নি।'

'টিভি দেখেন রোজ ?'

'হ্যাঁ দিদি।'

'কোথায় দেখেন ?'

'আমাদের বাজারে একটা দোকানে আছে।'

'তবে যে বললেন, সন্ধেবেলায় রাঁধেন ?'

'সন্ধেবেলা ছাড়া রাঁধব কখন ?'

'টিভিও ত সন্ধেবেলা ?'

'হ্যাঁ। ১৭৯ নম্বরের মাসিমার বাড়িতে দিনের বেলায় টিভি হয়।'

'তাই নাকি ? দেখেন ?'

'দিনে বেলায় টাইম কখন ? ঐ কাজ করতে-করতে যেটুকু দেখা যায়।'

'দিনের বেলায় টিভি আর-কোনো বাড়িতে দেখেন ?

'না। মাসিমাকে জিজ্ঞাসা করেছিলাম, মাসিমা বললেন, আমার ত বিলাতের টিভি, তাই দিনে চলে। আলোর এক বাড়িতেও বিলাতের টিভি আছে।'

'বিলাত কোথায় জানেন ?'

'হ্যাঁ।'

'কোথায় ?'

‘ঐ ত সাহেবরা থাকে।’

‘আপনি সাহেব দেখেছেন?’

‘কী যে বলেন, রোজই দেখি।’

‘রোজ কী দেখেন? সাহেব না বিলাত?’

‘সাহেবরা ত রোজই বাইরে যায়, কাজে।’

‘বললেন যে, সাহেবরা বিলাতে থাকে।’

‘হ্যাঁ থাকে।’

‘তা হলে রোজ সাহেব দেখেন কোত্থেকে?

‘আমি যখন রোজ কাজে বেরুই, তখনই সাহেবদের গাড়ি ধোয়া-মোছার কাজ শুরু হয়ে যায়। আমার রাখাল, ধরেন, আর-একটু মাথা চাড়া দিলেই গাড়িমোছার কাজে ঢোকাব।’

‘সব গাড়িই সাহেবদের গাড়ি?’

‘সাহেবদের গাড়িই বেশি। ৩০২-এর দাদাবাবুরও গাড়ি আছে। ৭২৯-এর দাদাবাবুর অফিস থেকে গাড়ি আসে। সন্ধে-বেলায় স্কুটার নিয়ে বৌদির সঙ্গে গড়িয়াহাটে বাজার করতে যায়।’

‘বলছিলেন বিলাতের গল্প, শুরু করলেন সাহেব আর দাদাবাবুর গল্প।’

‘সব গল্পই এক। আমাদের কি আর একটা কথা নিয়ে থাকলে চলে দিদি, এক মুখে সাত কথা সারতে হয়।’

‘আপনি ত এখানে কত সাহেব দেখেন?’

‘সেটা একটা কথা হল দিদি? আমরা না থাকলে সাহেবদের চলবে কী করে?

‘তবে যে বললেন, সাহেবরা বিলাতে থাকে, আপনি কি বিলাতে গেছেন?’

‘হ্যাঁ, গেছি।’

‘মানে, যোধপুরটাই বিলাত?’

‘তা কেন? যোধপুর ত যোধপুর।’

‘যোধপুরেও সাহেব থাকে।’

‘সাহেবরা ত সব জায়গাতেই থাকে।’

‘তা হলে বললেন যে সাহেবরা বিলাতে থাকে?’

‘সাহেবরা সব জায়গাতেই থাকে, না থাকলে চলবে কী করে?’

‘কেন ?’

‘এক জায়গায় থাকলে নানা জায়গার এত সব কাজকম্ম দেখবে কে ?’

‘সেটা কি হয় নাকি ? একজন মানুষ দুই জায়গায় থাকতে পারে ?’

‘কী যে কথা আপনার দিদি ! একটা লোককে একসঙ্গে কত জায়গায় থাকতে হয়। এই যে আমরা মথুরাপুরের লোক কলকাতায় এসেছি, কলকাতার লোক মথুরাপুর যাচ্ছে। কত !’

‘মানে, আপনারাও সাহেব ?’

‘আমাদের আর-কখনো মথুরাপুর যাওয়া হল ?’

‘কিন্তু সাহেবদের হয়।’

‘সাহেবরা না গেলে সূর্য-চন্দ্র উঠবে কী করে, এত ট্রেন গাড়ি এরোপ্লেন চলবে কী করে ? দেখেন-না, এক মিনিট পর-পর একটা ট্রেন এদিকে ছোটে, আর একটা ট্রেন ওদিকে ছোটে।

‘এই সব ট্রেন বিলাতে যায় ?’

‘হ্যাঁ। বিলাত-টিলাত ত যেতেই হয়।’

‘আচ্ছা, কাজেকম্মে যারা বাইরে যায়, তারা সবাই সাহেব ?’

‘তা ত হয়ই। সাহেবরা বাড়ি থেকে বেরলে তবে আমাদের কাজ।’

‘তাই ত বলছিলাম, যারা বাইরে যায়, তারাই সাহেব।’

‘হতে পারে। কাজের কি কিছু ঠিক আছে ?’

‘এই যারা গাড়ি চড়ে যায়, ট্রেনে চড়ে যায় সবাই সাহেব ?’

‘হতে পারে। প্লেনেও ত যায় শুনি।’

‘আপনি প্লেন দেখেছেন ?’

‘রোজই দেখি। ঐ সব দেখে আমরা টাইম ঠিক করি। সাড়ে সাতটায়, সন্ধ্যায়, একটা আসে ঐ উত্তর-পশ্চিম কোণ থেকে। তারপর কাছাকাছি এসে পুব দিকে বেঁকে যায়। রাত দুটোর সময় আবার একটা ঐ পুব থেকে উঠে ঐ উত্তর-পশ্চিম দিকে চলে যায়।’

‘রাত দুটোর সময় কি জেগে থাকেন নাকি রোজ ?’

‘না-না। কিন্তু আমার ছোট ছেলেটা পেচ্ছাব-টেচ্ছাব করে দিলে ঘুম চটে যায়। তখন ঐ আওয়াজ শুনি। ওটাকে গাড়ি

ধোয়ার কাজে লাগিয়েছিলাম, কিন্তু এখনো ত চাকার ওপর মাথা ওঠে না।'

'আপনার স্বামী ত কাজ করতে বাইরে যান?'

'বাইরে না-গেলে কাজ দেবে কে? তবে এখন কাজের একটা ব্যবস্থা হয়েছে। একেবারে কাজ পায় না, এমন দিন যায় না।'

'উনি কি বিলাতে যান, রোজ?

'হ্যাঁ দিদি। এখন কাজের ধাক্কায় বিলাতে যেতে হয় মাঝে-মধ্যেই। আমাদের একদিন পাতাল রেল চড়াবে। আমি যাব না বাবা, ভয় করে।'

'সে কী? রাতদিনই ট্রেন দেখছেন, ভয় কিসের!'

'এ ত দিদি গায়ের ওপর দিয়ে ট্রেন। পাতাল রেল ত মাথার ওপর দিয়ে ট্রেন।'

'মাথার ওপর দিয়ে কেন? বলুন, পায়ের তলা দিয়ে।'

'ছেলেদের নিয়ে যায় ত যাক। আমি যাব না।'

'ওটা ত বিলাতে?

'কী?'

'পাতাল ট্রেন বিলাতে না?'

'বিলাত ছাড়া অত নরম মাটি পাবেন কোথায় যে গর্ত খুঁড়ে আস্ত একটা ট্রেন ঢুকিয়ে দেবেন।'

'বিলাতে তা হলে হেঁটেও যাওয়া যায়। আপনারা গেলে ত হেঁটেই যাবেন?'

'আমাদের আর অত পয়সা কোথায় দিদি যে কোথাও যেতে হলেই ট্রেনে উঠব আর বাসে চাপব?'

'বিলাতে যাবেন কিন্তু মথুরাপুর যাবেন না?'

'যাই কী করে দিদি? কামাই দেব কী করে?'

'বিলাতে যাওয়া যায়, মথুরাপুর যাওয়া যায় না?

'হ্যাঁ, দিদি। বিলাত ত কাছে। এক বিকেলে দুই বাড়ির কাজে ছুটি নিলে বা আগাম করে দিলেই বিলাত যাওয়া যায়।'

'আর মথুরাপুর?'

'কয়েকটা দিন ছুটি নিতে হবে। কতগুলো স্টেশন!'

'ঐ কথাটার ত কোনো জবাব দিলেন না?'

'হ্যাঁ দিদি, কিন্তু তার আগেও ত নিরোধ না বিরোধ।'

'ছোট ছেলে হওয়ার আগে নিরোধ বন্ধ করলেন কেন?

'তখন ত আমার স্বামীর কাজ জুটেছে। আমিই বললাম—ছাড়ো ত তোমার নিরোধ। পেটে বাচ্চা ধরার শরীর আমার। বাচ্চা না হতে-হতে পেটে বাত ধরে গেল। তা আমার স্বামী বলল—এখন ত তোরও আয় আছে, তুই যখন চাচ্ছিস হোক বাচ্চা। তাইতে আমার ছোটটা।'

'ছোট বাচ্চাটা তা হলে আপনার ইচ্ছের ফল?'

'অ্যাঁ?'

'আপনি চেয়েছিলেন বলেই আপনার স্বামী রাজি হলেন?'

'অ্যাঁ?'

'আপনার স্বামী ত বাচ্চা চাইতেন না?'

'দিদি, আপনাদের কথাবার্তাই আলাদা। পুরুষ না চাইলে কি বাচ্চা হামাগুড়ি দিয়ে বাইরে থেকে পেটে ঢুকবে? পুরুষ না চাইলে বাচ্চা পেটে আসবে কোত্থেকে? বাচ্চার বিছন ত আর মেয়েদের পেটে থাকে না; পুরুষের পেটে থাকে। সেখান থেকে সে আপনার পেটে না দিলে আপনি পাবেন কী করে?'

'আরে, বাচ্চাটা ত মাকেই প্রসব করতে হয়।'

'পেটের বাচ্চা বাড়তে-বাড়তে যেদিন পেট থেকে বেরনোর মত হয়, সেদিন বেরিয়ে যায়। মেয়ে হলে কি প্রসব ঠেকানো যায়? কিন্তু পুরুষ হলে জন্ম ঠেকানো যায়। আপনি কী জিজ্ঞাসা করছিলেন?'

'আপনি ত রেগে গেলেন।'

'না, না, রাগিনি, রাগব কেন, বলেন।'

'আমি ভেবেছিলাম আপনার ছোট ছেলেটা বোধহয় আপনার ইচ্ছার ফল।'

'অ্যাঁ?'

'মানে, আপনি বললেন বলেই ত আপনার স্বামী সেবার ঐ নিরোধ-টিরোধ ছাড়লেন?'

'ও কি আর ছাড়ে নাকি? ও ত নেশার জিনিশ। আমাদের এখানে অনেক মেয়েও খায়, ঐ নেশা।'

'আপনি কখনো ঐ-সব নেশা করেননি ?'

'কী যে বলেন দিদি ! এক কত্তার নেশার ফলেই ছেলে মাত্র দুটো, আমিও ঐ নেশা করলে আর দেখতে হবে না। বাচ্চাকাচ্চা ত আর হবেই না, এ বাচ্চা দুটোও শুকিয়ে যাবে। ছোটটা ত শুকনোই।'

'আপনি কি আরো বাচ্চা চান ?'

'চাওয়া-চাওয়া করেন কেন ? এ কি ভাত, না রুটি, যে চেয়ে খাব ? আমার এই শরীরটাতে কতগুলো বাচ্চা ধরার কথা, সেখানে সারা জন্মে মাত্র দুটো বাচ্চা ধরেছি। এতে কি শরীরই থাকে, না জীবনই থাকে ? এর মধ্যে চাওয়ার কি আছে দিদি ? রেললাইনকে কি জিজ্ঞাসা করতে যান নাকি তুমি কি চাও তোমার ওপর দিয়ে ট্রেন যাক।'

'বেশি বাচ্চা হলে ত বাচ্চার শরীরও খারাপ হয়, মায়ের শরীরও খারাপ হয়। আপনি-না টিভি দেখেন ?'

'সে কী হয় কে জানে ? আমাদের আর বাচ্চা হল কই ?'

'দুটো ত হয়েছে।'

'তাতে তাদেরও শরীর যা আমারও শরীর তা। বেশি বাচ্চা না হলে মায়ের বুকে দুধ আসে ? গর্ভ খালি থাকলে শরীর শুকিয়ে যায় না ?'

'সে না-হয় বুঝলাম। তা হলে ত আপনার একটা শরীরের হিশেব থাকা উচিত—কবে এখানে এসেছেন, কবে বাচ্চা হল। সে সব ত কিছুই বলতে পারছেন না।'

'আমি যা জানি সবই ত বললাম দিদি। আর ত কিছু জানি না। আমাদের ত সময় নিয়ে কোনো কাজ নেই, তাই সময়টা মনে থাকে না। কী দিয়ে মনে রাখব বলেন ?'

'যা দিয়ে সবাই মনে রাখে—নিজের বয়স, ছেলেমেয়ের বয়স, কোনো ঘটনা দিয়ে, ধরেন, আপনি ত টিভি দেখেন, অলিম্পিক, এশিয়াড এ-সব শোনেননি ? সবাই দৌড়য়, লাফায়, সাঁতার কাটে—'

'শুনি দিদি, দেখিও, কিন্তু মনে থাকে না।'

'মনে থাকে না ? নাকি মনে রাখেন না ?'

'ঐ হল আর কী !'

'টিভির সব সিনেমা পুরো দেখেন ?'

'মন লেগে গেলে দেখি। রান্না করতে হয় ত সন্ধেবেলা, বেশি দেরি করা যায় না।'

'কোন সিনেমায় বেশি মন লাগে ?'

'গুরুদক্ষিণা।'

'সে ত বললেন একবার, আর ?'

'হিন্দি সিনেমায়।'

'আপনি হিন্দি জানেন ?'

'না।'

'বলতে পারেন ?'

'না।'

'বুঝতে পারেন ?'

'কাজের সময় পারি, অন্য সময় পারি না।'

'সিনেমার হিন্দি ?'

'বুঝতে পারি।'

'সেটা ত আর কাজের সময় নয়, কী করে বোঝেন ?'

'গল্পটা বোঝা যায়। তখন কথাও বোঝা যায়।'

'শেষ কোন হিন্দি সিনেমা দেখেছেন ?'

'রোজই ত দেখি। কালই দেখেছি। নাম মনে থাকে না।'

'টিভিতে ত বিজ্ঞাপন, সিরিয়্যাল এ-সবও হয়।'

'হ্যাঁ হয়। দেখি।'

'কী সিরিয়্যাল দেখেছেন ?'

'ঐ তো বুনিয়াদ, নুক্কড়।'

'বাবা, তাহলে ত অনেক দিন থেকে দেখছেন। দুটোর মধ্যে কোনটা ভাল ?'

'বুনিয়াদ।'

'কেন ? নুক্কড়।'

'সে ত এখানকার মতই। বুনিয়াদে রাজবাড়ি ছিল।'

'সিনেমায় রাজবাড়ি-মোটরগাড়ি এগুলো দেখতে ভাল ?'

'হ্যাঁ। কালারে আরো ভাল।'

'রামায়ণ-মহাভারত দুটোই দেখেছেন ?'

'বাবা, না দেখলে চলে? তবে রামায়ণটা শেষের দিকে খুব ঝুল। রাম আর সীতা দুজনেই কাঁদে। তাও একটু ঘোড়াটোড়া ধরে যুদ্ধ লাগছিল, সেও ত ভেস্তে গেল।'

'যুদ্ধ খুব ভাল লাগে দেখতে?'

'হ্যাঁ। ফাইটিং।'

'ফাইটিং ত এখনকার ছবিতে। রামায়ণ-মহাভারতের যুদ্ধ?'

'সেও ভাল। তবে মহাভারতের যুদ্ধ ভাল। অনেক অস্ত্র, সাঁই-সাঁই, বিরাট-বিরাট লোক।'

'আপনি কি রামায়ণ-মহাভারতের এই সব গল্প আগে জানতেন? ছোটবেলা শুনেছেন?'

'ছোটবেলাটেলায় কিছু শুনিনি। শূর্পণখা আর তারকা-রাক্ষসী আর পুতনা রাক্ষসীর গল্প জানতাম। রাবণ ত সীতাকে চুরি করে নিয়ে গিয়েছিল। তাই নিয়ে রাম-রাবণের যুদ্ধ।'

'যাত্রাটাত্রায় আগে দেখেননি?'

'কী?'

'এই রামায়ণ-মহাভারতের গল্প?'

'দেখেছি কি না মনে নেই।'

'মহাভারতের গল্প?'

'কিছু জানি না।'

'টিভিতে দেখলেন যে—এখনো জানেন না?'

'এখন একটু-একটু জানি। কিন্তু বললে মনে পড়বে। নিজের থেকে কিছু মনে পড়ে না।'

'কী বলছেন? যুধিষ্ঠির, ভীম, অর্জুন, দ্রৌপদী এই সব নাম মনে পড়ে না?'

'হ্যাঁ। তা পড়ে।'

'ছোটবেলা এসব গল্প শোনেননি?'

'ভীম শুনেছি।'

'দ্রৌপদীর কথা শোনেননি? দ্রৌপদী? পঞ্চপাণ্ডব?'

'হ্যাঁ, শুনেছি।'

'কী শুনেছেন?'

'পাঁচজনের এক বৌ ছিল।'

'আর?'

'দেওররা কাপড় খুলে ন্যাংটো করে দিয়েছিল।'

তিন

এত বছর ধরে যে মুখটাকে এত নিবিড়তায় পাঠ করে এসেছে শমিতা, সেই মুখটির শুশ্রূষার আহ্বান সে কি পড়ে নিতে চেয়েছিল।

সৌরাংশু পড়ার ভিতর থেকে চোখ তুলে শমিতার দিকে তাকান—বোধহয় একটু হাসিও ছিল ঠোঁটে। চোখটা তুলেই সৌরাংশু নামিয়ে নেন লেখার ওপরে।

শমিতা প্রধানত সৌরাংশুর পাঠের দিকেই তাকিয়েছিল। সৌরাংশুর মুখের ওপর আলোছায়ার খেলায়, তাঁর ঠোঁটের আর ভুরুর ভঙ্গিতে, চোখের পাতা একটু টেনে তোলায় বা না তোলায়, চিবুকের দু-একটা ভাঙচুরে শমিতা ঠিক বুঝে নিতে পারে স্যারের কেমন লাগছে।

সৌরাংশুর ভঙ্গি এত কম, এত কম যে তাঁর মুখ দেখে যখন কিছু বোঝা যায় তখন সন্দেহ হয় তাঁর শরীর খারাপ হয়েছে। তেমনি মনে হয়েছিল শমিতার—প্রথম ঢুকে। কী এক শ্রান্তির ভিতর থেকে নিজেকে ভাসিয়ে রেখেছিলেন সৌরাংশু।

কিন্তু সৌরাংশুকে এমন নীরবে পড়তে দেখে আসছে ত শমিতা কত-কত বছর। যখন স্যার তাঁকে চিনতেনও না, তখন থেকে। ক্লাশে কোনো কারণে একটু বিরক্ত হলে সেটাও বুঝতে দিতে চাইতেন না সৌরাংশু। গোপন করতে চাইতেন। রেজিস্টারটার ওপর চোখ নামিয়ে তার মলাটটার একটা কোণ একটু তুলতেন আর নামাতেন। তখন থেকেই শমিতার স্যারের দিকে তাকানো আর ফুরয় না। ফুরয়ওনি। অত কম বয়সে কী একটা মজাই পেত শমিতা? এত নামকরা এক অর্থনীতিবিদ্ অধ্যাপক, তিনি নিজেকে এত গোপন করতে চান কয়েকটি মাত্র ভঙ্গি দিয়ে।

তখন আর তাদের কটা ক্লাশই-বা নিতেন স্যার? কিন্তু কম দেখতে পেত বলেই সৌরাংশুকে দেখার একটা নেশাই পেয়ে বসেছিল তাকে—অত কম বয়সে এ সব নেশা যেমন সর্বগ্রাসী হয়, তেমনি সর্বগ্রাসী নেশা। কী করে, কী করে স্যারের রুটিনটাই তার জানা হয়ে গিয়েছিল। ক্লাশ ভাঙার বা বসার হিশেব কষে সারাদিনে একবার অন্তত বিপরীত দিক থেকে সৌরাংশুর মুখের দিকে নিজের মুখ তুলে তাকানো চাইই। কখনো-কখনো সূর্যের আলোর বিপরীতে সে মুখ স্পষ্ট দেখা যেত না—তবু! আর, সবার অগোচরে, সৌরাংশুর মুখ, চোখ, ভুরু, ঠোঁট, চিবুক, উচ্চারণ, হাতের আঙুলের মুদ্রার পাঠোদ্ধার করে যেত সে। সেই পাঠোদ্ধারেই ছিল তার কৈশোর-যৌবনের এক তন্ময়তা, একেবারে আত্মবিস্মৃত গহন তন্ময়তা। তারপর ত সে স্যারের একেবারে ছাত্রী হয়ে গেল—সেও ত কতদিন পর। যদিও স্যার তার নাম জেনেছেন ক্লাশেই, চিনতেনও, দেখা হলে, থেমেই জিজ্ঞাসা করতেন, কেমন আছ, কিন্তু শমিতার ততদিনে জানা হয়ে গেছে সৌরাংশু বিশেষভাবে তাকে তখনো জানেননি। সে সব ঘটেছে, তার বিয়ের পর, চাকরির পর, বাচ্চা হওয়ার পর যখন সে নতুন-নতুন কাজ নিয়ে স্যারের সঙ্গে দেখা করেছে। শমিতা নিজের কাছে খুব পরিষ্কার নয় যে সৌরাংশুর সঙ্গে দেখাসাক্ষাৎ রাখার জন্যেই সে এই সব প্রশ্ন নিজের মনে তৈরি করে তুলেছে—হাসপাতালের প্রসূতিদের পুষ্টি, বা মেয়েসন্তানদের খাবার, বা এই যাকে স্যার বলেছেন শ্রমের সামাজিক রূপ—নাকি প্রশ্নগুলো তৈরি হয়ে ওঠায়ই সে সৌরাংশুর সঙ্গে কথা বলতে এসেছে। শমিতার কাছে এ দুটো বিষয়ের মধ্যে কোনো ফারাক নেই, দুটো এমনই স্বাধীন অথচ পরস্পরনির্ভর। এই ধরণের জিজ্ঞাসা তৈরি হয়ে উঠতই ত স্যারের পড়ানোর পদ্ধতি থেকে, প্রশ্নগুলো আকার নিত স্যারের লেখার পদ্ধতি ধেকে, প্রশ্নগুলো ব্যাপ্তি চাইত স্যারের প্রগাঢ়তার পদ্ধতি থেকে। আবার শমিতা এটাও জানত—প্রশ্নগুলো একান্ত তারই, তাকেই তার জবাব খুঁজতে হবে, জিজ্ঞাসার পেছনে যে ব্যক্তিত্ব থাকে সেটা শমিতারই, সৌরাংশুর নয়। আবার শমিতা এটাও জানে, সৌরাংশু ছাড়া কোনো প্রশ্ন তার মনে এমন আকারই

নিত না। শমিতার নিজের ভিতরে কোনো দ্বন্দ্ব ছিল না, নিজেকে নিয়ে কোনো অস্পষ্টতা ছিল না।

সেই ফার্স্ট ইয়ার থেকে এই বুড়ি বয়স পর্যন্ত যে মুখটাকে এত গোপনে এত গভীরে দেখে আসছে শমিতা সে মুখ এখন আর নিজেকে আড়াল করবে কী দিয়ে? আর, স্যার আড়াল করবেনই-বা কেন? তিনি ত আর জানেন না, শমিতা তাঁকে কতটাই নির্ভুল আন্দাজ করতে পারে। এখন অবিশ্যি কখনো-কখনো মাঝেমধ্যে চমকে ওঠেন। দু-একদিন বলেও ফেলেছেন, সে কী, তুমি বুঝলে কী করে! কিন্তু তাতে শমিতা একটু চিন্তিতই হয়েছে। কোথাও কি চিড় ধরেছে স্যারের সেই সমাহিত ব্যক্তিত্বের আড়ালহীন স্বচ্ছতায়? স্যারের ব্যক্তিত্বের কোনো আড়াল নেই—এটাই তাঁকে এতটা আড়াল দেয়। সবাই তাঁকে একটু দূরেরও ভাবে কিন্তু সবাইই জানে তাঁর কাছে গেলেই তিনি আপন হয়ে উঠবেন। কখনো কখনো অকারণ রাগে শমিতা ভেবেছে স্যার যদি সত্যি একটু আড়াল রাখতেন পাণ্ডিত্যের বা আস্থার বা মানবসম্পর্কের, তা হলে ওঁর যন্ত্রণা বোধহয় একটু কম হত। শমিতা কী করে জেনে যায় সৌরাংশুর যন্ত্রণা, শমিতা নিজে সেটা কখনো বোঝার চেষ্টা করেনি। এক ছেলের মা হয়েও যে ছাত্রী থেকে যেতে পারে তার অন্তত এটুকু বিবেচনাবোধ থাকে—নিজের বোধ ও অনুভবের সব প্রক্রিয়া কখনো বুঝে উঠতে নেই। বুঝে ওঠা যায় না। বুঝে উঠতে চাইলে আর চেষ্টা করলে বোধ আর অনুভবের শুদ্ধতাটুকু হারিয়ে গিয়ে জট পাকিয়ে যায়। একবার হারিয়ে গেলে সে শুদ্ধতা আর খুঁজে পাবে না শমিতা। সৌরাংশু সম্পর্কে তার বোধ আর অনুভবের সেই শুদ্ধতা সে কিছুতেই খোয়াতে চায় না।

এত বছর ধরে যে মুখটাকে এত নিবিড়তায় পাঠ করে এসেছে শমিতা সে মুখটা তার লেখা পড়তে পড়তে কেমন বদলে যাচ্ছে তা না দেখে সে থাকে কী করে?

স্যারের পড়া শুরু করাটার মধ্যে এক ধরনের সচেতনতা আছে। সামনে শমিতা বসে আছে—তার দিক থেকে মুখটা সম্পূর্ণ ফেরাতে চান না। শমিতা দেখেছে—কারো দিক থেকেই সৌরাংশু মুখ

সরাতে চান না। টেবিলের ওপর ফাইলটা রেখে শমিতার দিকেই মুখটা রেখে ঘাড়টা একটু বাঁয়ে হেলিয়ে দ্রুত পড়ে যান। প্রথমে ঠোঁটে একটু হাসি লেগে থাকে—সেটা হাসি নয়, শমিতার উপস্থিতি সম্পর্কে সচেতনতার প্রকাশ। হাতে একটা পেন্সিলও থাকে। পৃষ্ঠা খুব তাড়াতাড়ি উল্টে যান আর সাধারণত দ্বিতীয় পৃষ্ঠার মাঝামাঝি পেঁছিতে-পেঁছিতেই লেখাটার ভিতরে ঢুকে যান—আত্মবিস্মৃত। ঠোঁটের সেই অস্পষ্ট হাসিটা মুছে যায়, বরং ঠোঁটদুটো ক্রমেই বেশি চাপা দেখায়। এরপর থুতনিতেও একটা ছোট্ট দাগ পড়ে, ঠোঁটদুটির চাপের ফলে। দ্বিতীয় পাতা শেষ হওয়ার আগেই ফাইলটা তুলে নেন নিজের চোখের সামনে—পেছনের জানলা থেকে আলো আসে, ঘাড়টা একটু উঁচু করে পড়েন, তাঁকে বয়স্ক দেখায়, গলায় টানটান দাগ পড়ে, পাঞ্জাবির ফাঁক দিয়ে ডান কন্ঠার হাড় যেখানে গলায় মিশেছে সেই জায়গাটা দেখা যায়। শমিতা এতক্ষণে স্যারকে সম্পূর্ণ দেখার সুযোগ পায়।

শমিতা দেখে—ঢুকেই সে সৌরাংশুকে যে-রকম ক্লান্ত দেখেছিল ধীরে-ধীরে সেই ক্লান্তিটা তাঁর মুখ থেকে খসে যাচ্ছে, ঝরে যাচ্ছে। তাঁর মুখের ভিতর থেকে, যেন চামড়ার ভিতর থেকে একটা কৌতূহলের তৃপ্তি, বা বলা যায়, তাঁর মননের সামনে একটা সম্মুখ-প্রশ্নে তাঁর শক্তি, সংহত ও দীপ্ত হয়ে ওঠে। তিনি হয়ত এই ইন্টারভিয়ুগুলির ভিতর নতুন একটা ভাষা পাচ্ছিলেন, যা তাঁর অনুমানক্ষমতার বাইরে। এত, এত, এত দীর্ঘদিনের চর্চায় সৌরাংশু অর্থনীতির কোনো প্রশ্নেই অপ্রত্যাশিতের চমক বোধহয় আর পান না। স্যার তো জানেন—কখন কী বলে, কোন বুলি কখন কপচানো হয়, স্যারও কপচান, আবার কখন কী হারিয়ে যায়। স্যার তো জানেন—অঙ্কের আড়ালে অর্থনীতির আসল প্রশ্নটা কোথায় হারিয়ে যায়, আবার কোথায় অঙ্কের আড়াল ভেঙেই সেই আসল প্রশ্নটা বেরিয়ে আসে। শমিতা দেখে—তাঁর লেখা পড়তে-পড়তে স্যার যেন গল্প-উপন্যাস পড়ার মত মগ্ন হয়ে যাচ্ছেন। শমিতার এই এক দুরতিক্রম্য সীমাবদ্ধতা। সে যখন সাক্ষাৎকার নেয় তখন সে যেমন সমস্ত খবর বের করে আনতে চায়, কোনো সম্ভাবনাই খতিয়ে না দেখে ছাড়ে না—তেমনি, সেই ইন্টারভিয়ুগুলো যখন

সে টেপ থেকে কাগজে লেখে তখন কোথাও তার এই চেতনা কাজ করে যে স্যার এগুলো পড়বেন, পড়তে গিয়ে স্যারকে সে যেন জীবনের আর অর্থনীতির এমন কিছু কথা জানাতে পারে যা স্যার সব সময় জানতে পারেন না, প্রায় কোনো সময়ই জানতে পারেন না, হয়ত বেশির ভাগ সময় তেমন কোনো প্রত্যাশাও তাঁর থাকে না, না পেতে-পেতে প্রত্যাশা তাঁর নষ্ট হয়ে গেছে, শমিতার লেখাগুলো পড়তে-পড়তে স্যারের স্মৃতি যেন জেগে ওঠে, প্রত্যাশা যেন জেগে ওঠে। শমিতা কি তার নিজের অর্থনীতিক জিজ্ঞাসার জবাব খুঁজে বেড়ায়, নাকি সৌরাংশুকে অর্থনীতির মূল জিজ্ঞাসা মনে করিয়ে দিতে সৌরাংশুর মনন ও যাপন থেকে দূর-দূরবর্তী জীবনকে সৌরাংশুর কাছে উপস্থিত করে ?

জানলার দিকে পেছন ফিরে চেয়ারটা একটু পেছনে হেলিয়ে মাথাটা একটু উঁচু করে পড়তে বোধহয় স্যারের সুবিধে হয়। সে সুবিধেটা চশমার পাওয়ারের জন্যেও হতে পারে, পেছনের আলোর সুবিধের জন্যেও হতে পারে। কিন্তু সে-রকম পড়তে হলে তাঁকে ফাইলটা দুহাতে চোখের সামনে ধরে থাকতে হয়—দুই হাতলে কনুইয়ের ভর রেখে। এ-রকম বেশিক্ষণ রাখলে হাতে নিশ্চয়ই ব্যথা হয় স্যারের—শমিতা অনুমান করে। তখন সৌরাংশু হাতটা নামিয়ে হাতলের ওপর আঙুল থেকে কনুই পর্যন্ত বিশ্রাম দেন। ঘাড়টা একটু নুয়ে আসে। আবার এরই মধ্যে ডান পায়ের ওপর বাঁ পা-টা রেখে হাঁটুর ওপর ফাইলটা নামান, তাতে ঘাড়টা আর-একটু সোজা রেখে পড়তে পারেন। কিন্তু শমিতাই-বা এমন মোটা ফাইলটা কেন সৌরাংশুর হাতে তুলে দেয়! সে ত কাগজগুলো আলগা দিতে পারত। সৌরাংশু তাহলে তাঁর সুবিধেমত এক গোছা কাগজ তুলে নিয়ে তাঁর পক্ষে আরামদায়ক ভঙ্গিতেই পড়ে যেতে পারতেন। কিন্তু ফাইল না হয় দিয়েছেই শমিতা, তাই বলে কি স্যার সেটা খুলে কাগজগুলো বের করে নিতে পারতেন না ? নিজের পড়ার সুবিধেটা ত সৌরাংশুই সবচেয়ে ভাল বুঝবেন।

কথাটা মনে আসার পর থেকেই শমিতার অনুশোচনা হতে থাকে ও সেটা বাড়তে থাকে। এতদিন ধরে সে স্যারের কাছে লেখা দেখাতে আসছে আর এতদিনে সে কি না বুঝতে পারল—সৌরাংশু

কোন ভঙ্গিতে সবচেয়ে সহজে পড়েন। অনুশোচনাটা তার এমনই তীব্র হয়ে উঠতে থাকে যে 'স্যার, দেখি' বলে পুরো ফাইলটা সৌরাংশুর হাত থেকে নিয়ে খুলে দেয়ার ইচ্ছাটা সে দমন করতে পারে তার স্বভাবের অন্তরস্থতার জোরে। শমিতার এ ভুল আর কোনোদিন হবে না, কিন্তু শমিতা এই মুহূর্তে সেই ভুল সংশোধনের সামান্য নাটকীয়তাটুকুও করতে পারবে না শুধু এই কারণে যে সৌরাংশুর মত তীক্ষ্ণ বুদ্ধির মানুষ বুঝে ফেলতে পারেন, কেন শমিতা এমন করছে। তীক্ষ্ণ বুদ্ধির মানুষ হলেই কি শমিতার অমন আচমকা ব্যবহারের পেছনের চিন্তা অনুমান করতে পারবে, যে-কোনো তীক্ষ্ণ বুদ্ধির মানুষ? নাকি তার জন্যে প্রয়োজন তীক্ষ্ণ অনুভব? শমিতা জানে সে যদি এখন, 'স্যার, একটু—' বলে একটা অসমাপ্ত বাক্য উচ্চারণ করে ফাইলটা নিয়ে কাগজগুলো খুলে সৌরাংশুর সামনে রাখে, তা হলে সৌরাংশু মুহূর্তের জন্যেও তাকে বুঝতে দেবেন না তিনি কিছু বুঝলেন বরং নিজের মনোযোগ অক্ষুণ্ণ রাখতে হয়ত শুধু তাকিয়ে থাকবেন ফাইলের দিকে, হয়ত তাকিয়ে থাকবেন সিলিঙের দিকে, বা একটু ঘাড় ঘুরিয়ে জানলা দিয়ে বাইরের আকাশের দিকে কিন্তু কাগজগুলো আবার হাতে তুলে নেয়ার সময় শমিতার দিকে একবার তাকাবেন কৃতজ্ঞের মত। ঐ প্রায় ভগ্নাংশপরিমাণ চাহনির অপরিমেয়তার ভয়েই শমিতা এখনই পারছে না ফাইলটা চাইতে। কিন্তু লজ্জায় ও আত্মধিক্কারে সে নিজের ভিতরেই নিজে কুঁকড়ে যায়। সৌরাংশু যখন হাতদুটো খাড়া রেখে ফাইল দিয়ে তাঁর মুখ ঢেকে পড়ছেন, তখন, শমিতা ভেবে যায়, স্যার—হাতটা নামাচ্ছেন না কেন? কেন এতক্ষণ এত কষ্ট করে পড়ছেন। হাতদুটো হাতলের ওপর রাখলে অন্তত ব্যথাটা ত লাগবে না। আবার, সৌরাংশু হাত দুটো শুইয়ে রেখে ফাইল ধরে পড়তে-পড়তে ডান পায়ের ওপর বাঁ পা তুলে দিয়ে ঘাড়টা একটু তুলে পড়েন, তখন শমিতার মনে হতে থাকে, তা হলে কি ঘাড় নুইয়ে পড়তে স্যারের ঘাড়ে বা পিঠে ব্যথা হয়?

সৌরাংশু যখন তাঁর চোখের সামনে ফাইলটা খাড়া ধরে পড়েন, তখন শমিতা দেখতে পায় তাঁর কপালের ওপরের দিকটা আর সে চোখটা একটু নিচু করলে সৌরাংশুর চিবুকের একেবারে নিম্নদেশটা।

কপালের সেই ঊর্ধ্বতম অংশে সামান্য যে কুঞ্চন কখনো দেখা দেয় তা থেকে শমিতা অনুমানের চেষ্টা করে, কোথাও কি স্যারের কোনো খটকা লেগেছে, নাকি কোনো একটা প্রসঙ্গ অন্য ভাবনা উশকে দিয়েছে। খটকা লাগলে ত স্যার পেন্সিলে দাগ দিতেন, পরে জিজ্ঞাসা করবেন বলে। নিজের ভাবনা হলে, তা করতেন না, কিন্তু একটু স্থির তাকিয়ে থাকতেন। কোন লেখাটা পড়ছেন বুঝতে পারলে শমিতা কিছুটা আন্দাজ করতে পারত। সে-আন্দাজে একটা কৌতূহলও থাকে—মেলে কি না।

সৌরাংশু যখন ফাইলটা কোলের ওপর নামিয়ে পড়েন, তখন তাঁর পুরো মুখটাই ত শমিতার সামনে। শমিতা চোখদুটো সম্পূর্ণ মেলেই স্যারের পড়া দেখে। তার আর সৌরাংশুর মাঝখানে কয়েকটা মোটা বই পর-পর রাখা। তাতে সৌরাংশুর মুখটা আড়াল হয় না। ঘাড়টা একটু নুইয়ে পড়ার জন্যে কপালের মাঝখান থেকে চিবুকের মাঝখান পর্যন্ত একটা সরল রেখার মত দেখায়, চশমার ফ্রেমে ভুরুটা ঢাকা, নাকের নীচে ওপরের ঠোঁটের মাঝখানে ঢেউ-খেলানো ভাঁজ, চিবুকের শান। সবচেয়ে মজা লাগে শমিতার, স্যারের চোখের পাতাগুলো পেছনের আলোতে তাঁরই চোখের কোলে কেমন ছায়া ফেলেছে সেটা দেখতে। গলায় কুঞ্চন পড়ে।

কিন্তু স্যার যখন ডান পায়ের ওপর বাঁ পা তুলে ঘাড়টা সামান্য একটু সোজা করে পড়েন তখন শমিতার পক্ষে চোখ এমন সম্পূর্ণ খুলে দেখা একটু অস্বস্তিকর ঠেকে। কারণ তখন সৌরাংশুর চোখ তার চোখের সরলরেখায়, সৌরাংশুর মুখটা একেবারে সরাসরি তার মুখের সামনে, কোনো আড়াল নেই। তখন সৌরাংশুর চোখের মণিটাও দেখা যায়, বাঁ থেকে ডাইনে সরে যাচ্ছে প্রায় বোঝাই যায় না এমন গতিতে। বোঝা যায় শুধু তখন, যখন লাইনটা পড়া শেষ করে মণিদুটো মুহূর্তে বাঁ কোণে চলে এসে আবার ডাইনে সরে যেতে থাকে। যে-চোখের মণি দেখা যায় সে-চোখ ত লহমায় তার মুখের ওপরও স্থির হতে পারে এই আশঙ্কায় তখন শমিতা সম্পূর্ণ তাকিয়ে থাকতে পারে না, স্থির তাকিয়ে থাকতে পারে না। তেমন তাকিয়ে থাকতে পারে না বলেই সৌরাংশুর এই ভঙ্গিতে শমিতা তার প্রতিক্রিয়া সবচেয়ে গভীরে লক্ষ করে যেতে পারে।

দেখে, সৌরাংশুর দু-চোখের বিপরীত কোণের সেই পরিচিত কুঞ্চন —পাল্টা যুক্তি মনে এসেছে, এখন সৌরাংশু লেখা থেকে চোখ তুলে শমিতার মাথার ওপর দিয়ে ফাঁকা তাকিয়ে থাকতে পারেন। শমিতা দেখে, সৌরাংশুর বাঁ ভুরু যেখানে নাকের দিকে শেষ হয়েছে সেখানে প্রায় অদৃশ্য একটা হ্রস্বরেখার ফুটে ওঠা—সৌরাংশু বিরক্ত হয়েছেন অথবা যুক্তির উগ্রতায় আহত হয়েছেন। কিন্তু তেমন যুক্তি ত কিছু শমিতা দেয়ওনি। শমিতা দেখে সৌরাংশুর ঘাড়টা সম্মতি-জ্ঞাপক একটু দোলে-কি-দোলে না, বা, হাসির রেখা ফুটে ওঠে কি-ওঠে না। কখনো-কখনো সৌরাংশু তাঁর বাঁ হাতটা ঘাড়ের পেছনে নিয়ে গিয়ে চুলে বোলান—যেন কোনো একটা বিষয় সম্পর্কে মনস্থির করতে পারছেন না। তেমন অস্থিরতাতেও ঘাড় একটু অস্পষ্ট দোলান সৌরাংশু। শমিতা দেখে।

সৌরাংশু তখন পড়ে যাচ্ছিলেন শমিতার সঙ্গে একটি লোকের কথোপকথন। আবারও সেই পুরনো সমস্যা—লোকটির বয়স কিছুতেই অনুমান করা যাচ্ছে না। কিন্তু তার কাজের অভিজ্ঞতার ব্যাপকতা থেকে মনে হতে পারে লোকটির বয়স ৪০-মত হতেও পারে। কিন্তু সে যে কোন বয়সে বাংলাদেশ থেকে ভারতে এসেছে তার কোনো স্মৃতি নেই। দণ্ডকারণ্যে সে গিয়েছিল, অনেকদূর পর্যন্ত মনে হয়, বুঝি বাঙালি উদ্বাস্তুদের সঙ্গেই গিয়েছিল, কিন্তু পরে বোঝা যায় সে একটা কোম্পানির কর্মী ছিল, সে-কোম্পানির সঙ্গে উদ্বাস্তুদের দূরতম কোনো সম্পর্ক নেই, মনে হয় ইলেকট্রিক ইনজিনিয়ারিঙের কোনো কোম্পানি, তাদের নাকি অফিস বা কারখানা এখন হয়েছে সল্টলেকে। ফিলিপ্স নাকি? লোকটি খুব জোরের সঙ্গে না করে না কখনোই কিন্তু এই ইন্টারভিয়ুগুলো পড়তে-পড়তে সৌরাংশু এতদিনে জেনে গেছেন, এদের 'হ্যাঁ' না-বলার অর্থ সব সময়ই 'না', কোনো-কোনো সময় এমন-কি অস্পষ্ট 'হ্যাঁ' বলার অর্থও 'না'। দু-একবার লোকটি 'স' দিয়ে একটা কোম্পানির নাম বলার চেষ্টা করে—'সন্স', 'সমন্স', এই সব। আরো অনেকক্ষণ কথার পর জানা যায় লোকটি ট্র্যানজিস্টর ব্যবহারে ওস্তাদ হয়ে উঠেছিল। তাতে অবিশ্যি তার বয়স আন্দাজ করা যায় না। কারণ, হতে পারে, সে এমনি কোনো দলের সঙ্গে

গিয়েছিল, হাতে-হাতে কাজ শিখেছে। আবার, এও হতে পারে, সে কর্মী হিশেবেই গিয়েছিল। বাচ্চাদের আঙুলে ট্রানজিস্টরের কাজ খুব ভাল আসে। কোম্পানিটা বেশ বড় ছিল বোঝা যায়—মাঝেমধ্যেই সাহেবরা আসত, অনেক গাড়ি আসত। 'ক্যাজুয়াল' শব্দটাও সে অনেকবার ব্যবহার করেছে যাতে বোঝা যায় হয়ত ক্যাজুয়াল লেবার ছিল। কোম্পানি থেকে তার কাজ চলে যায় নাকি সেই কোম্পানিটিই উঠে যায়—এটা কিছুতেই স্পষ্ট হয় না। কিন্তু প্রথম থেকেই সে দণ্ডকারণ্যের উদ্বাস্তু পরিবারগুলির কথা যে-ভাবে বলে তাতে মনে হয়, সে হয় কোনো উদ্বাস্তু পরিবারের সঙ্গে দণ্ডকারণ্যে গিয়ে পরে এই কোম্পানিতে ঢুকে পড়ে অথবা, কোম্পানির কাজ চলে যাওয়ার পর সে দণ্ডকারণ্যের উদ্বাস্তুদের ওখানে যায়। 'পরিবার' কথাটা দু-একবার মাত্র সে বলে। কিন্তু শমিতা অনেক পরে অনেক ঘুরপথে আবার পরিবারের কথা তোলায় বলে, দণ্ডকারণ্যে সে এক বাড়ি পেয়েছিল, ঠিক 'পরিবার' না, বিধবার দুই নাবালক ছেলে, সে তাদের জমি দেখত, চাষ করত। ঐ 'পরিবার'ই হল। এমন একটা 'পরিবার' যে তৈরি করতে পারে, তার বয়স ত অন্তত কুড়ি-একুশ হতে হয় তখনই। অথচ তার পরের কাজকর্মের হিশেব নিলে তার এখনকার বয়স তা হলে দাঁড়ায় পঞ্চাশের ওপর। সেটা আবার চোখের হিশেবে বা এখানকার কাজের হিশেবে মেলে না। এখন লোকটি ডেকরেটরের দোকানের সঙ্গে আছে কিন্তু তার প্রধান কাজ বড়-বড় গেট বানানো, ফটো দেখে-দেখে। এ-কাজের রেট আলাদা। তার রেট আরো আলাদা। সে যে-দোকানে কাজ করে তার কাজ না থাকলে অন্য দোকানে স্পেশাল অর্ডার পেলে সে খেটে দিয়ে আসে। মালিক কোনো কমিশন খায় না। গেটের কাজ, ডেকরেটরের কাজ দিনে-দিনে বাড়ছে। তার নিজের ডেকরেটর হওয়ার ইচ্ছে আছে কিনা কখনো ভেবে দেখেনি। এখন ভাবতে বললেও ভাবে না। 'উচ্চাশা' শব্দটির কোনো অর্থ লোকটিকে বোঝানো যায় না। অনেক শব্দের পর 'উন্নতি' কথাটার একটা মানে ধরে নেয় কিন্তু সেই অর্থের সঙ্গে তার নিজের ব্যক্তিগত কোনো যোগ নেই।

সৌরাংশু পড়েন এক গাড়ির বডি মিস্ত্রির সঙ্গে কথাবার্তা। এ

লোকটি সময়ের বা বয়সের একটা আন্দাজ দিতে পারে বটে কিন্তু সেটাও খুব এলোমেলো। অনেক পরে বোঝা যায় লোকটি এসেছে ফুলিয়ার দিক থেকে, তারা পুরুষানুক্রমিক তাঁতি। বাবার তাঁতও আছে, তারা সাত ভাই, তার সঙ্গে বাড়ির কোনো সম্পর্ক নেই। কলকাতায় এসেছে অনেক দিন, ঢাকুরিয়ার রেল কলোনিতে খুব বেশি দিন আসেনি, এক গ্যারেজে কাজ করত, তার ওস্তাদ এখানে একটা ঘর যোগাড় করে দিয়েছিল। এখানেই বিয়ে হয়েছে, বাচ্চা হয়েছে। বিয়ের আগেও বৌ ঠিকে কাজ করত, এখনো করে। এক ছেলে এক মেয়ে ইস্কুলে পড়ে। ছেলেকে লাইনে আনবে না।

ডান পায়ের ওপর বাঁ পা রেখে, কোলের ওপর ফাইলটি মেলে রেখেই চোখ তোলেন সৌরাংশু, ধীরে, শমিতার পাশ দিয়ে বা শমিতার মাথার একটু ওপর দিয়ে একেবারে ঘরে ঢোকার দরজার দিকে, যেন দরজায় কেউ দাঁড়িয়ে।

শমিতা এ ভঙ্গি চেনে। স্যারের পড়া শেষ হয়ে গেছে। এখন স্যার এই লেখাগুলির বিষয়ই ভাবছেন। সে-ভাবনা যে তিনি শমিতাকে বলবেন সে-বিষয়ে শমিতা নিশ্চিত নয়। এমন অনেকবারই হয় যে এরপর সৌরাংশু ফাইলটা তার হাতে দিয়ে আর কী কী ধরনের লোকজনের সঙ্গে কথা বললে ভাল হয় সেটুকু মাত্র বলে দেন। বা, যাদের কথা পড়লেন তাদের কারো কাছে গিয়ে কোনো-কোনো নতুন খবর জেনে আসার কথা বলতে পারেন। বা, একটু আচমকা বলতে পারেন, কারো ছেলের সঙ্গে একটু কথা বলতে।

কিন্তু এ-সব বলার নিজস্ব রীতি আছে সৌরাংশুর। কখনোই এমন সরাসরি বলেন না। কতকগুলি প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করেন। সেই প্রশ্নের জবাব দিতে গিয়ে শমিতাকেই বলতে হয়—তা হলে স্যার আমি কি···। শমিতার গবেষণাপদ্ধতি শমিতাকে দিয়েই আবিষ্কার করিয়ে নেবেন স্যার।

অথচ শমিতা জানে, লেখাটা পড়া হয়ে যাওয়ার পর স্যার মোটেই শমিতাকে কী বলবেন, তা নিয়ে ভাবছেন না। ও-সব কথা তাঁর অভ্যেসেই এমন এসে গেছে যে এভাবে ছাড়া কথা বলতেই পারেন না। লেখাগুলো তাঁর কী রকম লাগল সে-কথাটাও কখনো সোজাসুজি বলতে পারেন না স্যার। কিন্তু একরকমভাবে জানিয়ে

দেন, তাঁর ভাল লেগেছে, বা তত ভাল লাগার মত কিছু পাননি।

শমিতার লেখা স্যারের যেমনই লাগুক তা নিয়ে তার মাথাব্যথা নেই। সে জানতে চায়, যখনই আসে তখনই জানতে চায়, লেখাটা পড়া হয়ে যাওয়ার পর স্যার যে এই কিছুক্ষণ কোনো কথা বলেন না, নিজের মত করে কিছু ভেবে যান, সেই ভাবনাটা কী? কোন ভাবনার শেষে স্যার কথা বলেন?

তাঁর কোলের ওপর রাখা শমিতার ফাইলটার পাতা পেছন থেকে একটু আলগা উল্টে যান সৌরাংশু, দু-এক পাতা, বুড়ো আঙুলের ডগায় যে-ক-পাতা উঠে আসে। ফাইলটার দিকেই তাকিয়ে ছিলেন তিনি। আবার বুড়ো আঙুলের ডগা দিয়ে অনেকগুলো পাতা তুলে নিয়ে ফরফর করে ছেড়ে দেন—সেদিকে তাকিয়ে তাকিয়ে। ফাইল থেকে চোখটা ওঠান না। এবার প্রথম দিকের কয়েকটি পাতা আলগা তোলেন, একে-একে। একটা পাতার খানিকটা জায়গা পড়তে থাকেন। এমন নয় যে তিনি এই জায়গাটাই খুঁজছিলেন। কিন্তু পড়তে-পড়তে এতটাই পড়েন যে তখন তাঁর নিজেরও আর মনে হয় না যে তিনি খুঁজছিলেন না; জায়গাটিতে এমনি চোখ পড়ে গেছে। পড়াটুকু শেষ হলে তিনি খুব ধীরে ফাইলটা বন্ধ করেন, যেন নিজেই খুব নিশ্চিত বোধ করছিলেন না যে তাঁর পড়া শেষ হয়েছে কি না। ফাইলটা বন্ধ করে দুহাতে সেটা টেবিলে তাঁর সামনে রেখে মুখটা শমিতার বিপরীতে বাঁয়ের জানলার দিকে ঘোরান। জানলা দিয়ে তাকিয়ে থাকেন।

লেখাগুলো যখন পড়ছিলেন, তাঁর মনে কিছু কথা আসছিল। পড়তে-পড়তে যেমন অনেক কথা মনে আসে আর ভেসে যায় তেমনি ভেসেও গিয়েছিল। ভেসে গেলেও কিছু কথা মনে থেকে যায় ও পড়া শেষ হয়ে গেলে মনে ফিরিয়ে আনাও যায়। বহুদিনের অভিজ্ঞ ও বিশেষজ্ঞ পাঠক সৌরাংশু এখন সেই চেষ্টাই করছিলেন। কিন্তু একজন ছাত্রীর করা কিছু সাক্ষাৎকার পড়ার পর তেমন কথা মনে ফিরিয়ে আনতে এত উদ্যোগ প্রয়োজন হয় কেন সৌরাংশুর।

সৌরাংশু মনে আসা ও ভেসে যাওয়া কথাগুলি ফিরিয়ে আনছিলেন না, তিনি শমিতার লেখা পড়তে-পড়তে তাঁর মনে যে-কথাগুলি জমে উঠেছিল তা থেকে নিজেকে সরিয়ে নিচ্ছেলেন।

হয়ত, শমিতাকে অতটা ভার দিতে চান না বলে। বা হয়ত, তাঁর নিজেরই কাছে কথাগুলো স্পষ্ট হয়ে ওঠেনি বলে। কিন্তু সব সত্যই ত অস্পষ্ট থেকে যায় যতক্ষণ পর্যন্ত তা অপ্রতিরোধ্য না হয়ে ওঠে।

হ্যাঁ, সৌরাংশু এখন পারেন বৈকি—এ-সব ধনতন্ত্রের সমাজের দলিল নাকি ধনতন্ত্রের সমাজের ভিতরে ঢুকতে পারছে না যে-সমাজ তার দলিল, এমন একটা তর্ক ফাঁদতে বা তর্কে ফাঁসতে। ভারতবর্ষের কৃষিতে ধনতন্ত্র এসেছে কিনা সে-তর্ক কি আজও মিটেছে? বা ভারতের রাষ্ট্রব্যবস্থা সামন্ততান্ত্রিক ও ধনতান্ত্রিক, নাকি ধনতান্ত্রিক ও মধ্যবিত্ত, নাকি আধা-ঔপনিবেশিক এই তর্কে ত ভারতের মার্ক্সবাদী-কমিউনিস্ট আন্দোলন এখনো টুকরো-টুকরো হচ্ছে। টুকরো-টুকরো হচ্ছে, কিন্তু মীমাংসা কি হয়েছে? মীমাংসা কি হওয়া সম্ভব?

কী ভাবে দেখবেন শমিতার এই ভয়ংকর কাহিনীগুলিকে? এগুলো কি ধনতান্ত্রিক উৎপাদন সম্পর্কের কাহিনী? নাকি ধনতান্ত্রিক উৎপাদন সম্পর্ক থেকে ছিটকে পড়ার কাহিনী? সবাই ত গ্রাম ছেড়ে শহরে আসছে, নানা কাজ করছে, শিখছে, সে-কাজ থেকে ছিটকে যাচ্ছে। আবার আর-এক কাজ শিখছে। যে-লোক ব্রিজ তৈরির কাজ করেছে বা ডিনামাইট চার্জের কাজ শিখেছিল বা করত, সে এখন ক্যাটারারের ঠাকুরের শাগরেদি করে—এ ত নিশ্চয় ধনতান্ত্রিক উৎপাদন সম্পর্ক থেকে ছিটকে আসার নিদর্শন। সৌরাংশু নিজে এই ঠাট্টাটা থেকেও সরে আসতে চাইছিলেন। তিনি একটা রসিকতাহীন সত্য নিজের কাছে অকারণে গোপনে পুনরুচ্চারণ করতে চাইছিলেন—হ্যাঁ, একেই ধনতন্ত্র বলে, এই ডিনামাইট চার্জকেও আবার এই ক্যাটারিং ব্যবসাকেও, এই সমগ্রতাকেই, সমাজিক সমগ্রতাকে। নিজের ভিতরের একটা ক্রোধ প্রশমিত করতে চাইছিলেন—কে বুঝিয়ে গেল যে শুধু অর্থনৈতিক উৎপাদন ব্যবস্থাকে ধনতন্ত্র বলে আর ধনতন্ত্রের সমগ্রতা থেকে সমাজ কখনো-কখনো মুক্তও থাকতে পারে। কথাটা বোঝাল ধনতান্ত্রিক সমাজের দার্শনিকরা—অ্যাডম স্মিথ থেকে মিল। আর তাকেই হজম করে নিল মার্ক্সবাদ? বা তথাকথিত মার্ক্সবাদ?

কিন্তু তথাকথিত মার্ক্সবাদই ত প্রকৃত মার্ক্সবাদ, মার্ক্স-নিরপেক্ষ মার্ক্সবাদ, বৈজ্ঞানিক মার্ক্সবাদ ?

সৌরাংশু নিজের মনের প্রশ্নের ভারে শমিতাকে ব্যস্ত করতে চাইছিলেন না বলে সময় নিচ্ছিলেন আর শমিতা তার ভিতরে-ভিতরে এইটুকুই শুধু জানার জন্যে আকুল হয়ে ওঠে তার লেখা স্যারকে কোন ভাবনায় উত্তেজিত করে তুলল ? শমিতা জানে, স্যার এ-রকম সময় নেন। শমিতা এটাও জানে, স্যার প্রথম যে-কথাগুলো বলবেন সেগুলো খুব সাবধানে বলা যাতে শমিতা অতিরিক্ত কিছু ভেবে না বসে। শমিতা এতদিনে এটাও জেনে গেছে, স্যার কথা বলতে-বলতে, ধীরে-ধীরে, শেষের দিকে তাকে জানিয়েই দেবেন, কেমন লাগল তাঁর। সেটাও দেবেন এই বিবেচনাবোধ থেকে যে হয়ত তা হলে শমিতা তার দায়িত্ব সম্পর্কে যথাযথ সচেতন হতে পারবে। কিন্তু স্যার কি এটা অনুমান করতে পারেন না, এই কথাগুলো না বললেও শমিতা কথাগুলো নিজে-নিজে জানে কিন্তু যা সে জানে না, যা সে জানতে কাতর, যা জানলে সে নিজের জিজ্ঞাসার অনেক গভীর পর্যন্ত দেখে নিতে পারে, তা হল, এই মুহূর্তে, তার লেখা পড়া হয়ে যাওয়ার অব্যবহিত পরে কোন ভাবনাগুলো স্যার একা-একা ভেবে নিচ্ছেন ? সেই বিনিময়ের জন্যে অস্থির হয়ে ওঠে শমিতা আর স্যারের ওপর থেকে চোখ নামিয়ে নেয়।

সৌরাংশু তখন মার্ক্স-এর 'গ্রুণ্ডরিজ'-এর ভূমিকার সেই জায়গাটা মনে আনতে চেষ্টা করছিলেন। অবিকল লাইনগুলো নয়, মার্ক্স-এর যুক্তি-কাঠামোটা। সেই অংশের যে-কথাগুলি প্রবচন হয়ে গেছে সেগুলিই ঘুরে ফিরে তাঁর মনে আসছিল, অভ্যাসের দোষে—'হিউম্যান অ্যানাটমি কনটেইনস এ কি টু দি অ্যানাটমি অব এপ', জীববিবর্তনের উন্নততর পর্যায়ের পরিচয় না জানলে নিম্নশ্রেণীর প্রাণীদের ভিতর সেই উন্নতির লক্ষণ চিনে নেয়া যায় না ; মার্ক্স ইতিহাস রচনার কালানুক্রমিতাকেই অস্বীকার করছিলেন, যেন বলতে চাইছিলেন ইতিহাস মানে ত এখনকার অবস্থার কোন সংকেত অতীতে ছিল, পুঁজি কাকে বলে না জানলে পুরাকালের জমির কর কাকে বলত বোঝা যাবে না, কিন্তু

'ক্যাপিটাল ক্যান সার্টেইনলি বি আনডারস্টুড উইদাউট গ্রাউন্ড রেন্ট'।

অভ্যস্ত এই সুভাষিতগুলি পেরিয়ে শেষ পর্যন্ত সৌরাংশু মনে আনতে পারেন মার্ক্স-এর ব্যাখ্যা।

অ্যাডাম স্মিথ সম্পদ তৈরির প্রক্রিয়াকে নিখিল ভুবনে ছড়িয়ে দিয়েছিলেন। তার আর-কোনো ছোট-ছোট ভাগ ছিল না—কৃষি, শিল্প, পশুপালন, ব্যাবসা-বাণিজ্য। সব, সব, সবই সম্পদ তৈরি করছে, 'ওয়েলথ' তৈরি করছে। 'ওয়েলথ' একটা বিমূর্ত অখণ্ডতা, তার যেমন কোনো বিশেষ বিগ্রহ নেই, নেই তেমন কোনো খণ্ড চেহারা। আর অ্যাডাম স্মিথের এই আবিষ্কারেই প্রতিষ্ঠিত হয়ে যায় শ্রমেরও বিমূর্ত অখণ্ডতা। ধনতন্ত্রের শ্রম আর প্রাচীন মানুষের শ্রম নয়। কোনো একজন শ্রমিকের শ্রম নয়। অসংখ্য বিচিত্র জটিল এক শ্রমের সমবায়। সমবায় ছাড়া সে-শ্রমের কোনো অস্তিত্বই নেই। এই শ্রমেরও কোনো বিশেষ বিগ্রহ নেই, নেই কোনো খণ্ড চেহারা। কে কোথায় কী কাজ করে সেটা নেহাতই একটা অপ্রাসঙ্গিক তথ্য। যে যেখানে যে-কাজই করুক, তাতেই তৈরি হচ্ছে শ্রমের সেই অখণ্ডতা, তাতেই শ্রম বিমূর্ত থেকে বিমূর্ততর হয়ে উঠছে।

সৌরাংশু মনে-মনে আঁচ পান তিনি যে-জায়গাটি খুঁজছিলেন প্রায় সেই জায়গাটিতেই পেঁাছে যাচ্ছেন। মার্ক্স যেন শমিতার এই লেখার মানুষজন নিয়েই মন্তব্য করে গেছেন—এই যারা ট্রানজিস্টর কারিগর থেকে হয়ে যায় ডেকরেটরের কারিগর, যারা তাঁতি থেকে হয়ে যায় গাড়ির বডিমিস্ত্রি, আবার সেখান থেকে হয়ে যায় ইটের গাড়ির দালাল; এই যাদের পেশার কোনো স্থিরতা নেই, রুজির কোনো স্থিরতা নেই, বসবাসের কোনো স্থিরতা নেই। মার্ক্স যে মন্তব্য করে গেছেন, সৌরাংশু সেটাকে উল্টে দিতে চান, তিনি সাবধানে তাই সেই মন্তব্যটি মনে আনছেন, খুব সাবধানে।

সৌরাংশু চাইছিলেন ইংরেজি পাঠের শব্দগুলিকেই মনে আনতে, নিজের জন্যে। সেটাও অনুবাদ, কিন্তু নিজের মনের নিভৃতিতে পুনরনুবাদের অনিশ্চয়তার ভিতর ঢুকতে চাইছিলেন না। তিনি শুধু চাইছিলেন, মার্ক্স-এর কথাটা শমিতার লেখাগুলোতে উল্টে

দিতে। সেই উল্টে দেয়ার প্রক্রিয়ায় একটা শ্লেষ আছে, তিতো শ্লেষ। সৌরাংশু সেই শ্লেষটা আস্বাদ করতে চান। একটু আত্মপীড়ন চান নাকি সৌরাংশু?

হ্যাঁ, মার্ক্স, 'গ্রুন্ডরিজ'-এ শ্রমের সেই বিমূর্তনের কথায় এসে 'ইনডিফারেন্স টু এনি স্পেসিফিক কাইন্ড অব লেবার....', শব্দগুলি মনে পড়ে যায় সৌরাংশুর, এই বাক্যাংশই ব্যবহার করেছিলেন। শব্দগুলি পেয়ে গিয়ে সৌরাংশু বাংলায় মনে-মনে উচ্চারণ না করে পারেন না—শ্রমের নির্দিষ্ট ধরনের প্রতি উপেক্ষা....। কেন? কখন আসে এ উদাসীনতা? বিজ্ঞানের সূত্রের যেমন ছেদ থাকে না, তেমনি ছেদহীনতায় সৌরাংশুর মনে আসে এ-উপেক্ষা একমাত্র সম্ভব শ্রমের এক অতি উন্নত সমগ্রতায়, এ-উপেক্ষা, মনে-মনে উচ্চারণ করেন সৌরাংশু, 'প্রিসাপোজেস এ ভেরি ডেভেলাপড্ টোট্যালিটি অব রিয়াল কাইন্ডস অব লেবার।' এর একটু পরেই আবার একটি প্রসঙ্গে ফিরে এসেছিলেন মার্ক্স প্রায় একই ভাষায়, শ্রমের নির্দিষ্ট কোনো ধরনের প্রতি এই উদাসীনতা, 'ইনডিফারেন্স টু স্পেসিফিক লেবারস করেসপন্ডস টু এ ফর্ম অব সোসাইটি ইন হুইচ ইনডিভি-জুয়ালস ক্যান উইথ ইজ ট্র্যান্সফার ফ্রম ওয়ান লেবার টু এনাদার', সৌরাংশু মনে-মনে উচ্চারণ করেন, 'হুইচ ইজ....', এবং এর পরের অংশটুকুও, কোন ধরনের কাজ কে করবে তা 'ম্যাটার অব চান্স ফর দেম।' শিল্প বিপ্লবের ইয়োরোপে কে খনিতে কাজ করছে, কে চটকলে, কে জাহাজ তৈরির কারখানায় কাজ করছে আর কে দুধ দোয়ানোর বা মাংসকাটার বা ইস্পাতগলানোর কারখানায়—সে সবই ত তার পক্ষে 'ম্যাটার অব চান্স', একটা ঘটনামাত্র, আর এক পেশা থেকে আর-এক পেশায় চলে যাওয়া ঘটে যেতে পারে অবলীলায়, 'উইথ ইজ'। ইয়োরোপের জনসংখ্যা থেকে এত শ্রমিক যোগাড় করাই ত ছিল কঠিন।

শমিতার লেখাগুলোতেও পেশা থেকে পেশায় মানুষ চলে আসছে অবলীলায়, 'উইথ ইজ', তাদের পক্ষেও কে কোথায় কাজ পাবে সেটা ত 'ম্যাটার অব চান্স'। কিন্তু ভারতীয় ধনতন্ত্রের জনভিত্তি ত ১০০ কোটি মানুষ। সেখানে ত শ্রমিক পাওয়া নিয়ে কোনো আশঙ্কা নেই। শ্রমিক জুটে যাবেই, আরো কম পয়সায়

শ্রমিক। আর সেই প্রক্রিয়ায় ট্র্যানজিস্টর মেকানিক হয়ে যায় ক্যাটারারের ঠাকুরের শাগরেদ, 'উইথ ইজ', কারণ সে-কাজটা পাওয়াও 'ম্যাটার অব চান্স।'

সৌরাংশু একবার শমিতার দিকে তাকান, বোধহয় তার ঠোঁটটা স্মিতই ছিল, শমিতা তার চোখ সরিয়ে নেয়। কিন্তু সৌরাংশুর আত্মশ্লেষের পীড়ন বোধহয় তখনো শেষ হয়নি। সৌরাংশু সেই শ্লেষকে সম্প্রসারিত করে ভাবতে পারছিলেন, শমিতার এই লোকজনের জীবিকা থেকে জীবিকায় সরে আসাটা প্রাকৃতিক, পশুপাখির খাবার সংগ্রহের মত। অথচ, তাতেও শ্রমের বিমূর্তন ঘটে যাচ্ছে।

সৌরাংশু যেন তাঁর ভিতরে-ভিতরে আরো এক প্রসঙ্গ তুলতে চান। কী কুটিল, গভীর, জটিল, গূঢ়, বিপরীত, নিয়তিসদৃশ ধনতন্ত্রের গতি। বা তার সর্পিলতা, পরিপাকশক্তি, চোয়ালের জোর। কতটাই সে পারে নিজেকে নিজেরই পাকে ঘিরে ফেলতে, আবার খণ্ডবিখণ্ড করে মুক্ত হতে। সমস্ত পূর্বতন ব্যবস্থাকে সে কেমন নিজের ভিতর টেনে নেয় আবার নিজের সুবিধেমত অপরিবর্তিত রাখে। কী বলেছিলেন মার্ক্স, ধনতন্ত্র শুধু তার নিজের সঙ্কটের সময় আত্মসমালোচনাপ্রবণ হয়, 'টাইমস অব ডেকাডেন্স'-এ 'সেলফক্রিটিসিজম'।

সৌরাংশু এতক্ষণ নিজেকে নিয়ে নিজেই বেড়াল-ইঁদুর খেলছিলেন, নিজেই বেড়াল, নিজেই ইঁদুর। নিজেই নিজের ইঁদুরের বেড়াল, নিজেই নিজের বেড়ালের ইঁদুর। এটা খুব স্পষ্ট ছিল না তাঁর কাছে—তিনি মার্ক্সকে নিয়েও খানিকটা বেড়াল-ইঁদুর খেলতে চাইছিলেন কি না। কিন্তু নিজের বা নিজেদের মার্ক্সবাদ নিয়ে ত চাইছিলেন। চাইছিলেন বটে আর মার্ক্স-এর পেশার প্রতি শ্রমিকের উদাসীনতার কথাটা শমিতার বেলায় এমন লাগসই উল্টে দিতে পেরে পীড়নের তৃপ্তিও পেয়েছিলেন বটে কিন্তু তিনি নিজেকে আরো পিষ্ট করতে চেয়েছিলেন। শমিতার লেখা নিয়ে শমিতার সঙ্গে কথা শুরুর আগেই সেই পেষণ সম্পূর্ণ করতে চাইছিলেন। তিনি কি শমিতাকে বুঝতে দিতে চান না—শমিতা তাঁকে এক ধরণের জারণের মুক্তি দিয়েছে। কিন্তু চাইছেনই-বা না

কেন? শমিতা তাঁর এই আত্মপীড়নের কারণ হল বলে দুঃখ পাবে? নাকি, শমিতা বুঝতেই পারবে না তার আত্মপীড়নের কারণ কী? অথবা শমিতা তার লেখায় যে-কঠিন সত্যের সামনে তাঁকে এনে ফেলেছে, সেখান থেকে শমিতার দিকে তাকাবার আগে পীড়নে-জারণে নিজের ভিতর এক শুদ্ধতা সঞ্চার করতে চান সৌরাংশু; সৌরাংশু কি নিজেকে শমিতার অনুভবের শুশ্রূষার জন্যে তৈরি করে তুলছেন?

সৌরাংশু মুখ ঘুরিয়ে শমিতার সঙ্গে তাঁর মনের দূরত্ব মাপতে চান? দেখেন, শমিতাও তাঁর দিকেই তাকিয়ে। কিন্তু সৌরাংশু সে-দূরত্ব মেপে ওঠার আগেই তাঁর মননের অন্তস্তল থেকে অব্যর্থ উঠে আসে বিদ্রূপ। ভারতবর্ষের ধনতন্ত্র এই এক খেলায় প্রথম থেকে নিজেকে মাতিয়ে রাখতে ও অন্যদের ভুলিয়ে রাখতে পেরেছে—যেন সে পুরো ধনতন্ত্র নয়, যেন তার সাবালকত্ব অর্জনে সব সময়ই সংকট, সব সময়ই সংকট যেন সে এক ব্যাহতবিকাশ চিরশিশু। ধনতন্ত্রের এই চিরসংকটের খেলায় তার সবচেয়ে বড় অবলম্বন ত মার্ক্সকথিত সেই আত্মসমালোচনা, 'টাইমস অব ডেকাডেন্স'-এ আত্মসমালোচনা।

মননের দীর্ঘ অভ্যাসে সৌরাংশু এবার তাঁর লক্ষকে পেয়ে যান আর সূত্রনির্ণয়ের পরাক্রান্ত চর্চায় সূত্রও বানিয়ে ফেলতে পারেন। ভারতবর্ষের ধনতন্ত্র চিরসংকটের ধোঁকা দেয়। আর সংকটকালে ধনতন্ত্রের আত্মসমালোচনা ভারতবর্ষের ধনতন্ত্রের হয়ে করে দেয় সৌরাংশুরাই, মার্ক্সবাদীরাই।

ধনতন্ত্রের সংকটের খেলায় ধনতন্ত্রের প্রয়োজনীয় আত্ম-সমালোচনা করে গেল, ধনতন্ত্র নয়, ভারতীয় মার্ক্সবাদী বুদ্ধি-জীবীরাই।

সৌরাংশু এই সূত্রের পরবর্তী অনিবার্য ধাপ থেকে নিজেকে সরিয়ে আনেন সাবধানে, সযত্নে। সৌরাংশুদের মার্ক্সবাদ ভারতীয় ধনতন্ত্রেরই আর-এক মুখ—এই সূত্র পর্যন্ত পৌঁছতে চান না তিনি, এর ভিতর সরলীকরণ অছে। কোনো সরলীকরণে যেতে চান না সৌরাংশু। তিনি তাঁর অবস্থান নির্দিষ্ট করে দিতে পেরেছেন—তাঁর, তাঁদের সমস্ত মার্ক্সবাদচর্চা ভারতীয় ধনতন্ত্রের

সংকটকালীন আত্মসমালোচনা। ভারতীয় ধনতন্ত্রও ধনতন্ত্রই। ভারতীয় বলে সে কিছু আধ্যাত্মিক নয়, সে উৎপাদনকে কিছু কম বিমূর্ত করে তোলে না, সে কিছু কম তৎপর নয়। বরং যেন, প্রাক্তন উপনিবেশের ধনতন্ত্র বলে সে কিছু অতিরিক্ত লাম্পট্যের সুযোগ পেয়েছে। আর সেই লাম্পট্য সত্ত্বেও ধনতন্ত্রের নিয়মেই ভারতীয় ধনতন্ত্র সমস্ত কিছুকেই গ্রাস করে নিতে পেরেছে। মার্ক্সবাদকেও।

সৌরাংশুর চোখের সামনে শর্মিতার লেখার মানুষজনের চেহারার একটা আন্দাজ আসে। রেললাইনের ভিতর বসবাসকারী সেই মানুষজনের ইতিহাসভোলা পদক্ষেপ, পদক্ষেপভোলা ইতিহাস! সময়জ্ঞান নেই, সময়ের বোধ নেই, জীবনযাপনের বোধ নেই, কিন্তু সময়ব্যাপী জীবনের অভ্যাস আছে।

'আঃ, ধনতন্ত্র যদি আর-একটু কম সর্বগ্রাসী হত!'

চার

শমিতার সঙ্গে কথোপকথনে সৌরাংশু কি স্বীকারোক্তির পথ খোঁজেন নাকি আত্মকথনের দায় থেকে মুক্তি নেন ?

শমিতার সঙ্গে কথা শুরু করার আগে সৌরাংশু হয়ত নিজের সঙ্গে নিজের সংলাপ শেষ করে নিচ্ছিলেন শ্লেষে, আত্মপীড়নে, অধীত বিদ্যা উল্টেপাল্টে, নিজের জ্ঞানতত্ত্বকে ঠাট্টাবিদ্রূপে টুকরো-টুকরো করে, নিজের আস্তিক্যকে পরিহাসে-পরিহাসে বিপর্যস্ত করে। শমিতা তাঁর কাছে এই যে-তথ্যগুলো সাজিয়ে দিয়েছে তাঁর সামনে নিজের নিরস্ত্রীকরণ সম্পূর্ণ না করে সৌরাংশু হয়ত মুখ খুলতে চাইছিলেন না। কিন্তু শমিতা ভিতরে-ভিতরে অস্থির হয়ে উঠছিল।

সৌরাংশুর এই অভ্যেসটা এতদিনই জানে শমিতা তবু এখন সে অস্থির না হয়ে পারছিল না। স্যার ত পড়ার পর কথা শুরু করতে সময় নেন। শমিতা ত এটাই জানতে চায় তার লেখা পড়ার পর স্যারের অব্যবহিত ভাবনাগুলো কী ? অথচ স্যার তাঁর নীরবতায় শমিতার পক্ষে সেই অত্যন্ত প্রয়োজনীয় সময়টাকেই অবান্তর করে দিচ্ছেন।

এরপর ত স্যার পরে কী কী করতে হবে বলবেন, পরে কোনদিন শমিতা আসবে জানতে চাইবেন, টেবিল ডায়ারিতে লিখে রাখবেন, তারপর স্যারের সঙ্গে পরবর্তী সাক্ষাতের মধ্যবর্তী দীর্ঘ বিরতি শুরু হয়ে যাবে।

সৌরাংশু ঠিক এই সময়ই জিজ্ঞাসা করে বসেন, 'এ-রকম আরো ইণ্টারভিয়ু তোমার করা হয়ে গেছে, না ?' খুব আলতো স্বরে কথাটা বলে মুখটা আবার জানলার দিকেই ঘুরিয়ে নেন সৌরাংশু,

যেন জবাবটা তত প্রাসঙ্গিক নয় তাঁর কাছে।

শমিতা বলে উঠতে চেয়েছিল 'হ্যাঁ স্যার'; সংখ্যাটাও সে বলে দিতে পারত; বলার আবেগে চেয়ারে তার শরীর ব্যগ্রতাও পায় কিন্তু বলতে গিয়ে দেখে তার গলা আটকে গেছে। মুহূর্তে শরীরের প্রস্তুতি ভেঙে যায়। ঘাড় ও চোখ নুইয়ে সম্মতি জানাতে শমিতা মাথা হেলায় বারতিন মাত্র। গলা পরিষ্কার করে সৌরাংশুর কথার জবার দেয়ার উদ্যোগ নিতে পারে না শমিতা, ঘাড় হেলিয়ে জবাব সারার পরও গলাটা পরিষ্কার করে নেয়ার সময় পায় না সে, পাছে ঠিক সেই মুহূর্তটিতেই সৌরাংশু আর-কিছু জিজ্ঞাসা করে বসেন। গলাটার কাছে নিজের বাঁ হাত নিয়ে গিয়ে বুড়ো আঙুল আর বাকি আঙুলগুলোর অন্তর্বর্তী অবকাশটা গলনালীর ওপর জোরে রেখে আঙুলগুলোর চাপে ঢোঁক গিলতে গিলতে গোপনে আন্দাজ নিতে চায় শমিতা, গলা তার কতখানি ধরে আছে আর কতটা জোরে কেশে গলাটা তাকে পরিষ্কার করে নিতে হবে। গলাটা সাফ করতে মাত্র একবারই আওয়াজ করতে পারে সে। তারপর তাড়াতাড়ি শুরু করে, 'আরো আট-দশটা তৈরি করে রাখা আছে, কিছু রাফেও আছে—'

বাক্যটা আর শেষ করে না শমিতা। সৌরাংশু হয়ত তার কথা শুনছেন না। তার লেখা যখন সৌরাংশু পড়ছিলেন তখন সৌরাংশুকে ঘিরে শমিতার মনে যে-উদ্বেগের নাটক তৈরি হয়েছিল সেটাকে ভেঙে দিয়ে সৌরাংশুর সঙ্গে কথোপকথনের জন্যে নিজেকে তৈরি করে নিচ্ছিল শমিতা। কিন্তু সৌরাংশু আবার তাঁর নীরবতায় ফিরে গিয়ে শমিতাকে অবসাদে ঠেলে দেন।

এরপর স্যার হয়ত বলবেন, সেই লেখাগুলো নিয়ে একদিন আসতে আর শমিতা হয়ত বলবে, সে কোনো একদিন লেখাগুলো সৌরাংশুর টেবিলে রেখে যাবে।

অবসাদের ভিতরও এই কাল্পনিক সংলাপে এমন নির্ভুল থাকে শমিতা কোন অভিমানে, যে স্যার বলেছেন বলেই সে কালই লেখাগুলো নিয়ে দেখা করতে ছুটে আসবে না, কিন্তু স্যার বলেছেন বলেই সে কোনো একদিন, কাল নয়, কোনো একদিন, লেখাগুলো নিয়ে আসবে, কিন্তু রেখে যাবে। সৌরাংশুর সঙ্গে

দেখা না করে রেখে যাবে। তেমনই ত দস্তুর। তেমনই ত হয়ে এসেছে। শমিতা কখনো তাদের দুই সাক্ষাতের মাঝখানের বিরতি ভাঙে না। স্যার লেখা দিয়ে যেতে বললে, সে দেখা না করে লেখা দিয়ে যাবে। স্যার দেখা করার দিন দিলে সে ঠিক সময়ে এসে দেখা করে যাবে। স্যার লেখাগুলো ফিরিয়ে দেয়ার দিন দিলে সে ঠিক সময়ে এসে ফেরত নিয়ে যাবে। কোনো দিনই সে কোনো সুযোগ নেয়নি, নেবে না। স্যারের সঙ্গে দুই সাক্ষাতের মাঝখানের বিরতিতেই সৌরাংশুর সে সবচেয়ে ঘনিষ্ঠ থাকে—কাজে, মননে আর বোধহয় তার অস্তিতেও।

কিন্তু তাই বলে কি সেই বিরতি এই সাক্ষাতের বিকল্প হতে পারে, এই যে সাক্ষাৎ নীরবতায় নীরবতায় শমিতার পক্ষে প্রায় অসহনীয় করে তুলছেন সৌরাংশু ?

সৌরাংশুরও কি দুই সাক্ষাতের মাঝখানে কোনো বিরতি নেই ? বিরতির শেষে কোনো সাক্ষাৎ নেই ?

সেই বিরতি ত আর-একটু পরেই শুরু হবে।

বা, হয়ত এখনি শুরু হয়ে যেতে পারে যদি শমিতা এই মুহূর্তে চেয়ার ছেড়ে উঠে দাঁড়ায়। যদি উঠে দাঁড়ায় স্যার কি তা হলে শমিতাকে আবার বসতে বলবেন ? বা কোনো ইঙ্গিতে জানাবেন, তাঁর কথা এখনো শেষ হয়নি ?

নাকি, শমিতা এখন চেয়ার ছেড়ে উঠে দাঁড়ালে স্যার ভেবে নিতে পারেন শমিতারই ফেরার কোনো তাড়া আছে ? ভাবলেও স্যার জিজ্ঞাসা করবেন না কিছু। তাঁর জরুরি কথা থাকলেও বাধা দেবেন না শমিতাকে। অথচ শমিতা স্যারের কাছে বসার জন্যেই উঠতে চায় !

বা, তেমন কোনো শেষ করার মত কথা স্যারের নেই ? যদি আজকের লেখা নিয়ে তাঁর কিছু কথা মনে এসে বলা না হয়ে থাকে, তা হলে সে কথা তিনি নিঃসন্দেহে পরের বার বলবেন। স্যার কখনো কোনো কথা ভোলেন না ?

তা হলে, তার লেখাটা পড়ার পর স্যার এতক্ষণ ভাবছিলেনটা কী ? তার লেখার ভিতর থেকে কোনো ভাবনা উশকে ওঠেনি তাঁর মনে ? তার লেখা তা হলে স্যারের ভাবনা উশকে দেয়ার পক্ষে

যথেষ্ট হয়নি ?

ঠিক এরকম একটা কথা একেবারে ব্যঞ্জনাহীন তার মনে এসে যাবে—শমিতা তার জন্যে একেবারে প্রস্তুত ছিল না। কিন্তু এরকম আচমকা মনে আসার পর শমিতা আর নিজেকে ঠেকাতে পারে না—সে অভিমানের তোড়ে আত্মবিশ্বাসের বিপরীতে প্রতিরোধহীন চলে যায়। গলা ভারী বোধ করে।

সেই বিপরীতবিন্দুতে পেঁছে সেখান থেকেই কোনো নতুন প্রতিক্রিয়াপুঞ্জ গড়ে তোলা তার স্বভাবে নেই। তাই সে কেঁদে ফেলতে পারে না বা হাত দিয়ে ফাইলটা তুলে নিতেও পারে না। অথচ নিজের ভিতরের হঠাৎ জমে ওঠা এই অভিমানটা ছাড়তেও ইচ্ছে করছিল না শমিতার একটু জ্বরো নেশায়। তবু নিজের সচেতনতার সবটুকু জোর খাটিয়ে ফিরে আসার দায়টাও সে অনুভব করে ব্যক্তিত্বের গভীরে। অনুভব করে অথচ প্রত্যাবর্তনের জন্যে প্রয়োজনীয় শক্তি সংহত করে না শমিতা।

তার নিজেরই আবার ভাল লাগে না—তার লেখা নিয়ে স্যারের প্রতিক্রিয়ার অনিশ্চয়তা সম্পর্কে তার নিজেরই ভিতর এমন অনিশ্চয়তার নাটুকেপনা গড়ে তোলা।

অথচ শমিতার এতটাই কর্তৃত্ব নিজের ওপর যে এটা বুঝতে তার ভুল হয় না সে হঠাৎ অনিশ্চয়তার মধ্যে পড়ে গেছে স্যারের প্রতিক্রিয়ার অনিশ্চয়তা নিয়ে নয়, স্যারকে নিয়েই।

তার কাজ নিয়ে পরের বার সে যখন আসবে তার আগে তার আর স্যারের মধ্যে একটা বিরতির সময়ই ত স্থির থাকবে! সেই বিরতি শুরু করে দেয়াটা শুধু শমিতারই ওপর নির্ভর করে? সেই বিরতির আরম্ভ বিলম্বিত করার কোনো দায় বা ইচ্ছে স্যারের নেই?

তার কাজটা ত স্যারের সঙ্গে একটা বিনিময়ের সেতু। বিনিময়টা শমিতাই চায়। কিন্তু বিনিময় শব্দটিই যখন শমিতা বেছে নিতে পারে অনুচ্চারণে, তখন কি সেই শব্দটিতেই নিহিত হয়ে যায় তার প্রত্যাশা? শমিতা জানে, সে বসে থাকতে পারে। স্যার যখন বলবেন বা ফাইলটা এগিয়ে দেবেন, উঠে পড়বে। কিন্তু এই বসে থাকার মধ্যে আত্মঅসম্মান আছে বিশেষত সে যখন এত এতগুলো

বছর ধরে জেনে এসেছে, স্যার কখনো তাকে উঠতে বলবেন না, বা ফাইলটা এগিয়ে দেবেন না।

শমিতার নিজেকে নিয়ে এতটা বোঝাপড়ার প্রক্রিয়ায় তার মনে হয়—সময় বোধহয় অনেকটাই পার হয়ে গেছে। তা হলে, এখন কি স্বাভাবিকভাবেই সে উঠে পড়তে পারে? শমিতার মনের ভিতরের ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়ার বৈপরীত্য কি স্বাভাবিক হয়েছে—এটা অনুমান করতে-করতেই আঁচলটাকে সামনে টেনে এনে চেয়ারে সোজা হয়ে ওঠে শমিতা, আর সৌরাংশু শমিতার সেই প্রস্তুত উপবেশনের দিকে তাকিয়ে খুব খাদে বলে ওঠেন, 'তোমার আগের লেখাগুলো থেকেই কথাটা আমার মাথায় এসেছিল, এবারের লেখাগুলোতে সেটা আরো জোর পেল। আচ্ছা, শমিতা, তুমি বোধহয় আমাদের অর্থনীতিচর্চা, মানে আমাদের জ্ঞানতত্ত্ব, এপিসটেমোলজি মানতে পারো না? না? তোমার বোধহয় মনে হয়—আমরা মানুষকে ভুলে থাকি, তাই না? তোমার লেখাগুলো পড়ে আমারও তাই মনে হচ্ছে।'

যে-সম্বোধনের জন্যে শমিতা নিজের ভিতর নিজে একটা দ্বন্দ্বে জড়িয়ে পড়েছিল সেই সম্বোধনটাই এত আকস্মিক ও এত মাঝখান থেকে শুরু হয় যে শমিতা শুধু বলে উঠতে পারে, 'স্যার?'

সৌরাংশুর কথা বলার স্বর ছিল এমন যেন অনেকক্ষণ ধরেই তিনি শমিতার সঙ্গে নীরবে কথা বলে যাচ্ছেন, এই কথাটা মাঝখানের একটা শ্রাব্য অংশমাত্র। কিন্তু শমিতার চমকে সেই ধারাবাহিকতা ছিল না। চমকটা খেয়াল করেন না বা গায়ে মাখেন না সৌরাংশু। তিনি বলে যান, 'তোমার লেখাগুলো পড়তে-পড়তে আমার মনে হচ্ছে অর্থনীতিতে আমরা এমন অনেক পদ ব্যবহার করি, এই যেমন ফর্মাল সেক্টর, ইনফর্মাল সেক্টর, বা পেটি প্রোডিউসার, হাই প্রফিট-হাই ওয়েজ সেক্টর, লো-প্রফিট, লোওয়েজ সেক্টর এই পদগুলির নির্দিষ্ট কোনো অর্থ নেই। আসলে হয়ত ঐ পদগুলির উদ্দেশ্য নির্দিষ্টতা নয়ও, আমরা হয়ত ঐ পদটি দিয়ে একটা কোনো নির্দিষ্টতা এড়াতে চাইছি, বাদ দিতে চাইছি। তাতে আর-একটা পদ অতিনির্দিষ্ট হয়ে পড়ছে। যেমন ধরো, আমাদের দেশের কৃষি-অর্থনীতির আলোচনায় বড় কৃষক, মাঝারি কৃষক, ছোট কৃষক এই

শব্দগুলি বহু বহু দিন কোনো নির্দিষ্ট অর্থনৈতিক শ্রেণী বা গোষ্ঠী হিশেবে চিহ্নিতই হয়ে ওঠেনি। সে ভাবে চিহ্নিত করাটা আমাদের কাজও ছিল না হয়ত। ধরো, পশ্চিমবঙ্গের বড় চাষীকে নিয়ে আমি যখন কথা বলছি তখন কি আর আমি পাঞ্জাব বা তামিলনাড়ুর বড় চাষীর সঙ্গে কোনো সমতার কথা ভাবছি। তা ত ভাবছিই না বরং বর্ধমানের বড় চাষী নিয়ে আলোচনা করতে গিয়ে সেই বড় চাষীর ধারণার মধ্যে এমন কি বীরভূমের বড় চাষীকেও অনেক সময় ধরি না। এ-সব জায়গায় যে-কাজটা করছি তার চেহারাটা স্পষ্ট করার জন্যে অন্য সব ভাগগুলোকে ব্যবহার করি। মানে, বড় চাষী কে, না, যে মাঝারি চাষীর চাইতে বড়। এরকম শ্রেণীভাগের মধ্যে অনেকখানি, অনেকখানি কেন, বেশিরভাগ, অংশই আবছা রাখি আমরা। কেন? নাকি যাতে ঐ আবছার সুযোগে যে-অংশের কাজটা আমি করছি তা স্পষ্ট হয়। অর্থ-নীতিতে বিশেষত, মাইক্রোতে, মাইক্রোতেই বা কেন, ম্যাক্রোতেও, সংজ্ঞার এই নমনীয়তা খুব কাজে আসে। বা, তুমি বলতে পারো, সংজ্ঞার এই নমনীয়তা অর্থনীতির পদ্ধতিরই অংশ। এই নমনীয়তা ছাড়া তুমি সংজ্ঞাকে তোমার আলোচনার ক্ষেত্রে অনমনীয় করে তুলতে পারো না।'

শমিতা ধরতে পারে না—সৌরাংশুর এই শেষ মন্তব্যটা তার সাধারণ কথার সূত্রেই এল, নাকি, শমিতার কাজের সূত্রেই এল। সে একটু হকচকিয়ে যায়, ঠোঁটটাও খোলে, কী বলবে না জেনেই খোলে, হয়ত বলত, স্যার, আমার কাজের কথা বলছেন? কিন্তু সেই কথাটা জিজ্ঞাসা করার অর্থহীনতা আন্দাজ করে থেমেও যায়। এমন কখনোই হয় না শমিতার। সে যা জানে না, তা নিয়ে কথা বলে না। সে যা বোঝে না, তা বুঝে না নিয়ে কথার জবাব দেয় না। শমিতা নিজের ভিতরে-ভিতরে এমন প্রস্তুতি নিতে পারে বলেই, তার চিন্তার গড়ে ওঠা, সেই চিন্তাকে আকার দিয়ে গড়ে তোলা, সেই চিন্তার আকারে গড়ে ওঠার প্রক্রিয়ায় প্রশ্নের ও উত্তরের নানা কোণ মেপে নেয়া—এসবে গোপন একান্ত নিভৃত দক্ষতা তার ব্যক্তিত্বের এমনই অংশ হয়ে গেছে যে শমিতা নিজের যতটা প্রকাশ করে, তার চাইতে অনেক বেশি থাকে অপ্রকাশ্য।

কিন্তু আজ শমিতা যখনই স্যারের আর-কিছু বলার নেই অনুমান করে, নিজেরই ওপর অনভ্যস্ত অভিমানে, চেয়ার ছেড়ে উঠে দাঁড়ানোর প্রস্তুতিতে পেছনের আঁচল সামনে টেনে এনে সোজা হয়ে গেছে, চেয়ারের কোনো অংশই তার শরীরকে ছুঁয়ে নেই একমাত্র পাটাতনটি ছাড়া, ফলে, সে যেন শূন্যতাতেই উপবেশনের ভঙ্গিতে আছে, তখন, তখনই সৌরাংশু কথা শুরু করায় শমিতার শরীরের ভঙ্গিই প্রথম শিথিল হতে থাকে, তার ডান মুঠো থেকে আঁচলের কোনা এলিয়ে যায় প্রথম, ফলে শরীরের ঋজু ভঙ্গিতে উঠে পড়ার প্রস্তুতি ভেঙে যাওয়ার ভাঁজ পড়ে শাড়ির আঁচলে ; আর চেয়ারে খাড়া উপবেশনের ঋজুতা থেকে সে, চেয়ারটা যেন একটা পাত্র, এমন ভঙ্গিতেই চেয়ারের ভিতরে এলিয়ে যেতে শুরু করে। অথচ সৌরাংশু কথা শুরু করেন এমনই খাদে যে প্রথম উচ্চারণেই শমিতা বুঝে যায় তার অভিমান কত তুচ্ছ ও অর্থহীন, স্যার এতক্ষণ তার লেখা নিয়ে তারই সঙ্গে কথা তৈরি করে তুলছিলেন, হয়ত স্যার, তার, শমিতার উত্তরগুলোও মনে মনেই শুনে নিচ্ছিলেন আর তারপর সেই মনে-মনে কথা বলার ঠিক একটি বিন্দুতে তাঁর কথাটা তাঁর মুখ দিয়ে বেরিয়ে এসেছে কিন্তু সে-সব নীরব সংলাপ শমিতা আন্দাজ করতেও পারল না, নিজেকে নিয়ে ব্যস্ত থেকে যাওয়ায় !

শমিতা এখন আর খেই ধরতে পারে না—সৌরাংশু অর্থনীতির প্রধানধারা-গৌণধারা নিয়ে কথা বলছেন, নাকি, সাধারণভাবেই অর্থনীতির ভাগ-উপভাগ নিয়ে কথা বলছেন, নাকি, শমিতাকে কিছু জিজ্ঞাসা করে তার জবাবের অপেক্ষায় আছেন।

কথা বলতে-বলতে সৌরাংশু তাঁর চোখ সরিয়ে নিয়েছেন জানলায়—সেখানে এখন পশ্চিমের সূর্যের আলোয় এ-বাড়িরই ছায়া। সেই ছায়াচ্ছন্নতা নিয়েই সৌরাংশু শমিতার ওপর চোখ ফিরিয়ে আনেন।

'আমি যেন তোমার এই কাজটার কী নাম একটা দিয়েছিলাম, তোমার মনে আছে ?' সৌরাংশু একটু হাসেন।

'সে কী স্যার ! আমি আমার কাজের নাম ভুলে যাব নাকি, আপনি ত বুঝিয়েই দিয়েছিলেন সেই দ্বিতীয় দফা লেখার পরই',

শমিতা জানে দরকার নেই, তবু মনে করিয়ে দেয়।

'বলেছিলাম, কলকাতার টানে ওরা আসে, কলকাতারই সামাজিক শ্রমের সংগঠন এগুলি। তোমার লেখা পড়ে নিজেকে ঠাট্টা করতে ইচ্ছে করছে। তোমার লেখার মানুষজন নিজেদের বাঁচা নিয়ে এমনই স্বয়ংসম্পূর্ণ যে আর-একজন কেউ তোমার কাজটাতে নাগরিক জনবিন্যাসের ডিমোগ্রাফির বিবরণ পড়বেন। তিনি তখন ওটাকে আমারই মত একটা অর্থহীন লেবেল দেবেন—জনবিন্যাসের সামাজিক সংগঠন।'

শমিতা খুক করে হেসে ওঠায় কথাটা থেমে যায় সৌরাংশুর, বা হয়ত তিনি ঐ পর্যন্তই বলছিলেন, শমিতা বলে, 'সে কি স্যার, আমায় কাজটা কি তকাই নাকি?'

কথাটা বলে ফেলে শমিতার ভিতরটা ঝর্ঝরে হয়ে যায় মুহূর্তে। সেই ঝর্ঝরতার মধ্যেই শমিতা আবার লজ্জা পেয়ে যায়, একেবারে গভীর লজ্জা। আর, সৌরাংশু শমিতার চোখের ওপর চোখ রেখে লহমার নীরবতার পর হেসে ফেলেন। ওই নীরবতার লহমাটুকুতেই শমিতা ঘাড় নিচু করে আবার তুলে সৌরাংশুর প্রাণময় হাসি দেখে নেয়। শমিতা হাসতে-হাসতেই অনুমান করে, সৌরাংশুর ভিতরটাও ঝর্ঝরে হয়ে যাচ্ছে; তাঁর মুখের ওপরের গ্লানি মুহূর্তে কেটে গিয়ে ত্বকের মৌলিক রঙ যেন দেখা যায়। শমিতার মনে হয়, সৌরাংশুর মুখমণ্ডল এতক্ষণ রক্তপ্রবাহবিরহিত ছিল।

কথাটা ত এক মুহূর্ত আগেও ভাবেনি শমিতা, বরং সে ত একটু অবসাদেই ছিল। কিন্তু এমন অব্যর্থ হাসি বেরিয়ে এল কী করে, কেনই-বা?

যৌথ কান্নার ভিতরেও মানুষ তার বেদনায় মানুষ থেকে বিচ্ছিন্ন থাকে কিন্তু যৌথ হাসিতে এমন এক মিলন ঘটে যায় মুহূর্তে মানুষ ঘনিষ্ঠতার হঠাৎ উত্তাপ পায়। কোথাও একটা নির্বেদ সঞ্চারিত হয়ে যাচ্ছিল—সৌরাংশুর ভিতরে। সেই নির্বেদ থেকে তিনি মুক্তি পাচ্ছিলেন না, এমন নয়, মুক্তি চাইছিলেন না। হয়ত নির্বেদের শুরু এখন থেকে, ক্রমেই এটা গভীরতর হবে। কিন্তু সৌরাংশুর মত তীক্ষ্ণ মননের মানুষ বুঝে যান, তাঁর আর

প্রত্যাবর্তনের কোনো অবলম্বন নেই, বা প্রত্যাবর্তনের কোনো অবলম্বন তিনি খুঁজবেনই না আর। অভ্যেসে হয়ত খুঁজবেন, মননের রীতি জানা আছে বলে ইয়োরোপীয় দর্শনের এনলাইটেনমেন্ট, বা আলোকপর্বের প্রতিক্রিয়া দিয়ে নিজের নির্বেদকে হয়ত দু-একটা আলগা আঘাত দেবেন, লেনিনের পার্টি গঠনরীতির সমালোচনাও হয়ত করতে চাইবেন শুধু তাতে দুটো-একটা আলগা যুক্তি জুটতে পারে বলে, রোজা লুকসেমবুর্গ-লেনিন বিতর্কের কথাও দু-একবার তুলতে পারেন, এমনকি 'ক্যাপিটাল'-এর দ্বিতীয় খণ্ড থেকে সম্পাদনাকালে মার্ক্সের অভিপ্রায় এঙ্গেলস্ বুঝে উঠতে পারেননি এসব কথাবার্তা ত হাতের কাছেই আছে। কিন্তু সৌরাংশু কোনো আগ্রহ বোধ করছিলেন না। তিনি নিজের মনে বুঝতে পারছিলেন, তিনি মাত্র ততটুকুই আগ্রহ ও উৎসাহ বোধ করে ফেলছেন যেটুকু এতদিনের প্রাচীন অভ্যাসের অবশেষ থেকে না করে পারছেন না। কিন্তু এগুলো সবই অভ্যাস, অভ্যাস, অভ্যাস। এমনকি এগুলো মৃতদেহ কাটাছেঁড়া করার অভ্যাসও নয়। সৌরাংশু জানেন সেই নির্বেদই এখন তাঁর জীবনী। কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধপ্রান্তরে প্রথম প্রবেশ করে অর্জুন বলেছিলেন, আমার কোনো আত্মরক্ষা নেই, আমার কোনো অস্ত্র নেই, কৌরবরা আমাকে মারুক, তাতেই আমার মঙ্গল—বেঁচে থাকার চাইতে আমার এখন মরণই শ্রেয়।

কিন্তু সৌরাংশুর ত কোনো কুরুক্ষেত্র নেই, রথ নেই, গাণ্ডীব নেই—তিনি অর্জুনবিষাদের মত এত মর্মান্তিক উচ্চারণ করবেন কোন জোরে। তাঁর ত এক থাকতে পারে নীরব নির্বেদ।

অথচ শমিতার ঐ আচমকা কৌতুকে কোথা থেকে আবার এক আসক্তি ছড়িয়ে যায় তাদের দুজনের মাঝখানে এই ঢাকুরিয়া রেল-কলোনির প্রসঙ্গটি ধরে।

সৌরাংশু জিজ্ঞাসা করেন, 'আচ্ছা, তোমার সঙ্গে এদের খুব ভাব হয়ে গিয়েছে, এই যে এত কথা বলছে তোমার সঙ্গে?'

জবাবটা কী হবে সেটা যেন শমিতা একটু ভাবে। সেই ফাঁকে সৌরাংশু যোগ করেন, 'তুমি যা লিখেছ, মানে টেপ থেকে লিখেছ, তার চাইতেও অনেক বেশি কথা ত ওরা বলে নিশ্চয়?'

'তা ত বলেই স্যার। কিন্তু আপনি ত আমাকে বলেছিলেন,

ওদের উচ্চারণ বা কথা বলার ধরণ অবিকল রাখার চেষ্টা না করতে। প্রথম দিকে ত আমি সে-রকমই করছিলাম। তাতে লেখাগুলো অনেক জ্যান্ত ঠেকছিল, কী সুন্দর করে কথা বলে স্যার, কথাগুলোকে যেন ছোঁয়া যায়। কিন্তু আপনি বললেন—সব সাধারণ বাংলায় লিখতে, নইলে, পড়তে গল্পের মত লাগে', শমিতা হাসে।

'কিন্তু তোমার এই মানুষজনকে ঠেকাবে কিসে? ভাষার বাঁধ দিয়েও মানুষ ঠেকাতে পারোনি। তোমার কথায়-কথায় তাদের ভিতরের কথা বেরিয়ে এসেছে।'

'আমি কিন্তু স্যার এদের সঙ্গে কথা বলার সময় সার্ভে বা অর্থনীতি বা তত্ত্বের কথা একেবারে ভাবিনি। সেটা ভেবেছি বরং টেপ থেকে কাগজে লেখার সময়। না হলে কিছু বাদই-বা দেব কী করে? মানে, বাছাবাছি করব কী করে?'

'তোমার লেখাগুলো পড়তে-পড়তে মনে হচ্ছিল, সত্যি আমরা এক তকাই জানি, হাতে কতকগুলো লেবেল আছে, সে লেবেলগুলো তৈরি হয়েছে ইয়োরোপে, আমেরিকায়, জাপানে। আমরা সুযোগ বুঝে সেগুলো লাগিয়ে দেই। তারপর লেবেলের সঙ্গে মানুষ মেলাই। ধরো, আমরা ত এটা অর্থনীতির একটা গৌণ ধারা নিয়ে কাজ করছি?'

'হ্যাঁ স্যার। সে ত বটেই। ঢাকুরিয়া রেলকলোনির লোকদের অর্থনৈতিক উদ্যোগ ত আর আমাদের দেশের প্রধান অর্থনৈতিক কর্মসূচি নয়', শমিতা আবারও হাসিয়ে দিতে পারে সৌরাংশুকে।

'বটেই ত, আর সে জন্যেই তুমি এটাকে বলবে, ইনফরম্যাল সেক্টর, গৌণ ধারা। কিন্তু এই লেবেলিঙের মূলসূত্রটা কী? পাবলিক সেক্টর, প্রাইভেট সেক্টর আর ইনফরম্যাল সেক্টর?'

এবার শমিতাকে হাসিয়ে ফেলেন সৌরাংশু। শমিতা বলে, 'এই কথাটা ওদের বলে এলে হয় স্যার—ভারতবর্ষের অর্থনীতিতে পাবলিক সেক্টর আর প্রাইভেট সেক্টর মিলে ফর্ম্যাল সেক্টর আর ঢাকুরিয়ার রেলকলোনিতে যারা ঘুঁটে দেয় আর টিকিট ব্ল্যাক করে তারা হল ইনফরম্যাল সেক্টর।'

শমিতার হাসির পাল্টা হাসিতে সৌরাংশু যোগ করেন, 'কিন্তু এটা ওদের জিজ্ঞাসা করার আগে নিজেদের জিজ্ঞাসা করলে ভাল

হয় না ? ধরো, ইয়োরোপে, আমেরিকায় কটা লোক হয়ত কিছু অন্য রকম কাজ করে। তাকে তাঁরা বলে দিতে পারেন গৌণ ধারা। আর তাঁরা একবার বলে দেয়ায় এই লেবেলটা যদি চালু হয়ে যায় তা হলে তোমাকেও এখানে সেটা লাগাতে হবে। সেখানে প্রধান ধারাটা এতই প্রধান যে গৌণ ধারাটাকে চিনে নিতে কষ্ট হয় না। কিন্তু সেই স্পষ্টতাটা ত তৃতীয় দুনিয়ার দেশগুলি সম্পর্কে আলোচনায় গুলিয়ে গেছে। আমাদের দেশের অর্থনীতিতে নানা ধরনের মিশ্রণ ত আছেই—ধনতান্ত্রিক অর্থনীতির সঙ্গে কৃষি অর্থ-নীতির মিশ্রণ, খামার অর্থনীতির সঙ্গে বাজার অর্থনীতির মিশ্রণ, উঁচু মজুরির সঙ্গে নিচু মজুরির মিশ্রণ। এই মিশ্রণ বোঝাতে গিয়ে এমন একটা লেবেল, ইনফরম্যাল সেক্টর, ব্যাপারটাকে যথেষ্ট অস্পষ্ট করে দিতে পারে। তাতে আমাদের সুবিধেই হয়। সুবিধে হয়—আমরা একটা বড় খাঁচার ভিতর সব ঢুকিয়ে দিতে পারি।'

শমিতার মুখটা মেলা ছিল সৌরাংশুরই মুখের দিকে। কিন্তু তার স্বর আর শ্বাস, শুধু তারই নয়, সৌরাংশুরও স্বর আর শ্বাস, কখনো যুগপৎ কখনো বিচ্ছিন্ন নিবিড়তায় যেন তাদের চার হাতের ভিতর সযত্নে আলগোছে ধরা কোনো প্রত্নবস্তুর ওপর। দৃষ্টির নিবিড়তায় তাঁরা উদ্ধার করতে চাইছিলেন সেই প্রত্নবস্তুর পরিচয়। সেই নিবিড়তার ভিতরও সৌরাংশু তাঁর মননের প্রবীণতায় বুঝতে পারেন, তিনি শমিতার এই লেখাগুলোকে উপলক্ষ ধরে অর্থনীতির এইসব ভাগাভাগি যে তুচ্ছ করে দিতে চাইছেন, উপেক্ষা করতে চাইছেন, ভাঙতে চাইছেন তার কারণ এটা নয় যে তিনি অন্য কোনো ভাগাভাগির সারবত্তা জেনে গেছেন। তার একমাত্র কারণ, সৌরাংশু এখন কোনো পরিস্থিতি বা অর্থনীতি বোঝার জন্যে কোনো তত্ত্বেরই প্রয়োগ আর ঘটাতে চান না। প্রথমে মনে হতে পারে, শমিতার লেখাগুলোর বাস্তবতার চাপ এত বেশি যে সৌরাংশু তাঁর মননের অভ্যাস ভাঙতে চাইছেন। চিরকালই তিনি প্রচলিত পদ্ধতিগুলিকে হেলায় বর্জন করে, নতুন পদ্ধতির দিকে হাত বাড়াবার সাহস দেখিয়ে তাঁর মননকে নতুন থেকে নতুনতর চ্যালেঞ্জের সামনে দাঁড় করাতে অভ্যস্ত।

যে-ভাবে তিনি ফরম্যাল সেক্টর আর ইনফরম্যাল সেক্টরের ভাগা-

ভাগির দেয়াল ভাঙছিলেন তাতে তাঁর পুরনো অভ্যেসের জের ছিল। হয়ত কখনো-কখনো তাঁর মননের নির্মাণক্ষমতার ইঙ্গিতও আসছিল, 'আমাদের দেশে বিড়ি বা রাজস্থান-গুজরাটের দেশী চুরুট ত ইনফরম্যাল সেক্টর। কারণ, সেখানে যন্ত্রের ব্যবহার নেই। তার শ্রমিক একজায়গায় বসে কাজ করে না। কিন্তু তুমি যদি টাকার লেনদেন আর কতগুলো হাত খাটছে তার হিশেব নিয়ে কথা বলতে চাও, তাহলে দেখবে এটা ফরম্যাল সেক্টর। অথচ আমাদের অর্থ-নীতির বিচারে তা আসবে না। আমি শুনেছি মুর্শিদাবাদের এক বিড়িমালিক এলিজাবেথ টেইলারকে মডেল করে বিজ্ঞাপন দেয়ার চেষ্টা করেছিল।'

শমিতা ঠিক ধরতে পারে না সৌরাংশু কী বলছেন। কিন্তু সেই বোঝার চেষ্টায় সেকেণ্ড কয়েক সে এলিজাবেথ টেইলারের ব্যাপারটা ভুলে থাকতে পারে। সেই সেকেণ্ড কয়েকের পর খিলখিল হাসিতে ভেঙে পড়ে শমিতা।

'কী দারুণ লাগত, স্যার!'

'কী?'

'এলিজাবেথ টেইলার জাহাজ মার্কা বিড়ি টানছেন।'

সৌরাংশুও হেসে ওঠেন, 'বিড়ি টানতে হবে কেন? ছবি হলেই ত হল।'

'স্যার, মুর্শিদাবাদের এক বিড়ির মালিক যদি এলিজাবেথ টেইলারের ছবি দিয়ে ক্যালেণ্ডার করে, সে-খবর ত আর এলিজাবেথের কানে পৌঁছবে না যে মামলা করবেন। আসলে ত ঐ ইনফরম্যাল সেক্টর বলতে চেয়েছেন যে তিনি সেলস ক্যাম্পেন তুলতে চান।'

'কিন্তু তবু তাকে ইনফরম্যাল সেক্টরই বলতে হবে? এটা হচ্ছে আমাদের সুবিধে, বলতে পারো দর্শকদের সুবিধে, অর্থনীতি করলেও আমরা ত দর্শকই, বা নজরদারির দর্শক। কিন্তু আমাদের সুবিধে হবে বলে যারা দুই রেললাইনের মাঝখানে এই রকম কঠিন জীবন যাপন করছে, তাদেরকেও একটা সেক্টর হতে হবে? বিজ্ঞান ত মানুষের জীবনকে ব্যাখ্যা করে, অপমান করে না।'

শমিতা চুপ করে থাকে। সে স্যারের কথার লক্ষ ধরতে পারে

না। বোধহয় তেমন কোনো লক্ষ ছিলও না সৌরাংশুর। মার্ক্সবাদের বৈজ্ঞানিকতায় শতাব্দ ছাড়িয়ে সহস্রাব্দে ব্যাপ্ত আস্থা নিয়ে, গ্রহ থেকে গ্রহান্তরের শূন্যতায় সাঁকোগড়া বিশ্বাস নিয়ে সৌরাংশু যে-নির্ভুল আত্মতায় তত্ত্ব বেছে নিতেন সেই নির্ভুলতা আর একাত্মতার কোনো হদিশ তিনি আর নিজের ভিতর খুঁজে পান না। মধ্য এশিয়ার মরুভূমিতে মানুষের জ্ঞান, আস্তিক্য ও কর্মের নবজাত অদ্বয় শক্তি নতুন যে-নদী বইয়েছে তারই পারে এখন আজারবাইজানের মানুষের সাম্প্রদায়িক দাঙ্গার রক্তে সেই অদ্বয়, মরুভূমিতে মৃত্যুর সংকেত হয়ে আছে—এ-পথে এগবেন না, সত্তর বছর পরেও ধ্বংস হবেন। শমিতার সঙ্গে কথোপকথনে সৌরাংশু আত্মকথনের দায় থেকে মুক্তি পেয়েছিলেন। তাই সেই কথোপ-কথনের সুযোগই নিচ্ছিলেন হয়ত। ভাঙছিলেন, যুক্তি দিয়ে যুক্তি ভাঙছিলেন, সিদ্ধান্ত ভাঙছিলেন।

আবার, একই সঙ্গে, এই আত্মবিনাশের সঙ্গে-সঙ্গেই হয়ত ছিল নিজের গভীর এক সত্যের সামনে, গভীর অথচ নির্মম সেই সত্যের সামনে, গভীর, নির্মম অথচ পরিত্রাণহীন সেই সত্যের সামনে দাঁড়ানোর সাহস সংগ্রহের প্রক্রিয়া। না, দাঁড়ানো নয়। দাঁড়ানো বলতে বোঝায় সৌরাংশুর একটা আত্মরক্ষা আছে। নেই। পরিত্রাণহীনতা মেনে নেয়ার প্রক্রিয়াতেই হয়ত এই ভাবে নিজেকে ব্যস্ত রাখছিলেন সৌরাংশু। শমিতার লেখাতে মানুষের বেঁচে থাকার এক দলিল তিনি পড়ে ফেলতে পারলেন—সে-বাঁচায় শুধু বেঁচে থাকাটা এক জৈব আকাঙ্ক্ষা, তত্ত্বহীন জৈব আকাঙ্ক্ষা। এই আকাঙ্ক্ষায় বেঁচে থাকার ব্যাখ্যায় তাঁর আয়ত্তের কোনো তত্ত্ব ব্যবহারে তাঁর কোনো আগ্রহ নেই। শমিতার লেখাগুলো সেই অনাগ্রহের একটা উপলক্ষ তাঁকে দিল। তিনি সেটা গ্রহণও করলেন।

'তোমার মত এ-রকম কিছু কাজই বোধহয় শুধু করতে পারলে হত।'

'কী কাজ স্যার?'

'এই-যে ঘুরেফিরে যেমন তুমি দেখছ, লিখছ—আমাদের চার-পাশের মানুষজন কী-রকম ভাবে বেঁচে আছে, কী ভাবে বেঁচে

আছে, কেন বেঁচে আছে।

শমিতা ঠোঁটে আঙুলচাপা দিয়ে বলে ওঠে, 'কিন্তু স্যার লেখা হলেও অর্থনীতি ত ঠেকে গেছে।'

সৌরাংশু প্রত্যুত্তরে একটু হেসে চুপ করে থাকেন। শমিতার মন্তব্য আর তার উত্তরে সৌরাংশুর নীরব হাসি যেন এই কাজটির সঙ্গে তাঁদের যৌথতা মূর্ত করে তোলে। সৌরাংশু আর শমিতার মাঝখানে কিছু বই উঁচু হয়ে আছে। সৌরাংশু যখন তাঁর চেয়ারটিকে ঘোরাচ্ছেন তখন কোনো-কোনো সময় এই সব বইপত্রের ফাঁক দিয়ে সৌরাংশু আর শমিতা অনেকখানি, কখনো-কখনো আড়ালহীন, মুখোমুখি হয়ে যাচ্ছেন বটে কিন্তু বেশির ভাগ সময়ই তাঁদের ভিতর এই বইগুলির আড়াল থাকে। এই কথা আর নীরব সম্মতির মধ্যে এই টেবিল আর তার বইয়ের স্তূপ কখন যেন অবান্তর হয়ে যায়—তাঁদের দুজনের অন্তবর্তী দেশ পূর্ণ করে ছড়িয়ে থাকে ঢাকুরিয়া রেলকলোনির মানুষজন। যৌথ সেই প্রয়াসে তাঁরা এই মানুষজনের সঙ্গে মিশে যান, যেমন, মেলায় বা উৎসবে, তাঁরা পরস্পরের দিকে তাকিয়ে এই একই অভিজ্ঞতার বিনিময় ঘটান, তাঁদের পরস্পরের চাহনির ভাষা বদলে যায়, যেমন বদলায় যখন স্বর যথেষ্ট অর্থবহ নয় বা দূরত্ব স্বরবহ নয়, তাঁরা পরস্পর তথ্য বিনিময় করে নিতে পারেন শুধু চাহনিতেই, তাঁরা এই মানুষজনের পরিসীমা রচনা করেছিলেন, অথচ তাঁদের এই বিনিময়ের মধ্য দিয়েই ধীরে-ধীরে কিন্তু অব্যর্থভাবে মানুষজনই তাঁদের পরিসীমা রচনা করে তুলতে থাকেন, তাঁরা ঢাকুরিয়া রেলকলোনির মানুষজনের কেন্দ্রে চলে আসেন, সে-কেন্দ্রে মুখের ভাষাতেই বিনিময় চলত, একটু পরেই সেই মুখের ভাষাই তাঁরা আশ্রয় করবেন, কিন্তু এখন সেই ভাষার কাছে পৌঁছনোর জন্যেও ত তাঁদের ভাষাহীনতার পর্বটা পেরতে হবে, কারণ, তাঁরা অপ্রস্তুত-ভাবে সেই ভাষাহীনতায় ঢুকে পড়েছেন, সৌরাংশুর ভিতর আবার সেই বোধটা জেগে ওঠে, বোধহয় তিনি স্বীকারোক্তির একটা জায়গা পেলেন, শমিতার কাছে তাঁর স্বীকারোক্তি শুরু হলে হয়ত সে স্বীকারোক্তি তার ভাষাও পাবে আর শমিতা ভাবে, তার ভিতরে-ভিতরে স্যারের সঙ্গে বিনিময়ের যে-এক প্রত্যাশা সে লালন করে

রেখেছে তার এই সারাটা জীবন ধরে, সেই প্রথম বছরের কলেজের কৈশোর থেকে এই ভরভরন্ত গিন্নিপনায় মধ্যবয়স পর্যন্ত, সেই বিনিময়টাই এবার একটা আকার পেতে চাইছে তারই তৈরি এই ঢাকুরিয়া রেলকলোনির মানুষজনের আঙিনায়।

সৌরাংশু কী খুঁজছিলেন? তাঁর স্বীকারোক্তির জন্যে একজন ব্যক্তি বা পুরোহিত, নাকি তাঁর স্বীকারোক্তির জন্যে এক ভাষা? সৌরাংশু কি জানেন, তাঁর স্বীকারোক্তির বিষয়টা কী? জানেন? নিশ্চিতভাবে জানেন? নাকি, ইতিহাসের এক নৈর্ব্যক্তিককে সৌরাংশু নেহাত তাঁর ব্যক্তিকে ধারণ করার ভুল করতে চাইছেন সহজ এই যুক্তিতে আর এই মুহূর্তে সেই যুক্তিটি গ্রহণযোগ্যও ঠেকে—ইতিহাসের গতিকে ব্যক্তিকতায় ধারণ করতে না-পারলে সে-গতি ত বাস্তব হয়ে ওঠে না; তাহলে ইতিহাসের পরাজয়কেও ব্যক্তিকতায় ধারণ করতে না পারলে সে-পরাজয় বাস্তব হয়ে ওঠে না; ইতিহাস ত জয়েন্ট স্টক কোম্পানি নয়—যার লাভের অংশ অংশীদাররা পান কিন্তু ক্ষতির দায় অংশীদারদের নিতে হয় না।

শমিতা সৌরাংশুর মনের এমনই দশায় তার সামনে ঢাকুরিয়ার মানুষজনদের হাজির করে দিল। সৌরাংশু অস্ত্রত্যাগে প্রস্তুতই ছিলেন, শমিতা অস্ত্রত্যাগ ঘটিয়ে দিল। এবার সৌরাংশু শমিতার কাছে বলবেন—মার্ক্সবাদ আর কমিউনিস্ট আন্দোলন আর অর্থনীতির সঙ্গে তাঁর সম্পর্ক গড়ে ওঠার কথা। সৌরাংশু ত কলেজে পড়া ইকনমিস্ট বা মার্ক্সিস্ট নন। কলেজের ছাত্র যখন তিনি তখনই তাঁকে পুলিশ গ্রেপ্তার করে, কমিউনিস্ট পার্টি বেআইনি হলে। তারপর, প্রেসিডেন্সি, দমদম। জেলের ভিতরে পুলিশের সঙ্গে খণ্ডযুদ্ধ। হাঙ্গার স্ট্রাইক। সেখান থেকে বক্সারে নির্বাসন। বক্সারের পাহাড় আর বৃষ্টি আর জঙ্গলের বিচ্ছিন্নতায় প্রথম মার্ক্সবাদের প্রকৃত পাঠ। অনিলদা ছিলেন, অনিল গোস্বামী। ইকনমিক্‌সের নেশা লেগে গেল, আর মার্ক্সবাদকে মনে হল বিজ্ঞান আর দর্শনের শেষ কথা। জেল থেকেই পরীক্ষা দিলেন, এম. এ। জেল থেকে বেরিয়েও জেলখানার ভিতরের পড়াশোনাই শুধু চলে। একদিনের জন্যে, এক মুহূর্তের জন্যেও সৌরাংশু মুখ তুলতে পারেননি। এ যেন এক অন্তহীন যুদ্ধ বাস্তবের সঙ্গে মননের।

যখন ইতিহাস এসে ঘাড় ধরে তাঁর মুখ তোলাল, তখন সৌরাংশু আবিষ্কার করলেন, তাঁর মনন আছে কিন্তু বাস্তব বদলে গেছে। তাঁর যাপিত জীবনের কথা বলে, শমিতার কাছে বলে, তিনি এবার তাঁর আত্মজীবনীর মুখোমুখি দাঁড়াতে চান, একটা বিধ্বস্ত, নষ্ট, ভবিষ্যৎহীন আত্মজীবনীর মুখোমুখি। সেই মুখোমুখি দাঁড়ানোর জন্যে দরকারি আত্মসচেতনতাটুকু শমিতা তার ভিতর জাগিয়ে দিতে পারল।

আর, শমিতা ত স্যারের সঙ্গে এই বিনিময়টুকু গড়ে তুলতেই চেয়ে আসছে। তার ব্যক্তিত্ব এমন শক্ত কাঠামোয় বাঁধা যে সেই বিনিময় গড়ে তোলার অস্থিরতায় সে স্যারের সঙ্গে কোনো ব্যক্তিগত সম্পর্ক তৈরি করার জন্যে কখনো কাতর হয়ে ওঠেনি। বা, তার নিজের ব্যক্তিগত জীবনে স্যারের জন্যে কোনো ব্যক্তিগত অবকাশ তৈরি হয়ে উঠতে দেয়নি। শমিতার ব্যক্তিগত আর ব্যক্তিত্ব এতই পৃথক ও স্বতন্ত্র। সে একের পর এক কাজ করেছে। স্যার তাঁকে এক সময় একের পর এক চাকরির কথা বলেছেন—সে 'না' বলে দিয়েছে। স্যার তাকে বিদেশে দু-একটি সেমিনারে পাঠাতে চেয়েছেন—সে 'না' করে দিয়েছে। তার ব্যক্তিগত অসুবিধে ত ছিলই, সবারই থাকে। সে-অসুবিধে কাটিয়েও ওঠা যেত, সবাই কাটায়। শমিতার স্বভাব এমনই যে ঐ চাকরি বা বিদেশযাত্রার জন্যে তার অত ঝামেলা করতে ইচ্ছে হয়নি। কিন্তু সঙ্গে-সঙ্গে এটাও সত্য যে সে স্যারের সঙ্গে দূরত্বটা ঘোচাতেও চায়নি হয়ত। সে তার নিজের মত কাজ করছে, যখন ইচ্ছে স্যারকে দেখিয়ে যাচ্ছে—এটাই তার কাছে ভাল ঠেকেছে। ঐ চাকরি বা বিদেশযাত্রার ভিতর ঢুকে পড়লে তার আর স্যারের সঙ্গে কোনো দূরত্ব থাকবে না, কোনো মোহও থাকবে না এই সম্পর্কের ব্যাপারে। কিন্তু মোহটাকেই ত জিইয়ে রাখতে চায় শমিতা। নিজের ভিতরের এই আরো কঠিন সত্যটা নিজেরই অজ্ঞানতায় গচ্ছিত রেখে শমিতা তার নিজের বাড়িঘর-চাকরিবাকরি মেলাবে। শমিতা তার স্বয়ং-সম্পূর্ণতাকে রক্ষা করেছে নতুন চাকরি আর বিদেশযাত্রার আক্রমণ থেকে। আর, হয়ত তারই ফলে স্যারের সঙ্গে তার বিনিময় এমনই অপরিহার্য হয়ে উঠেছে তার জীবনে। শেষ পর্যন্ত সেই

বিনিময়টাই ঘটতে যাচ্ছে নাকি? সোভিয়েত ইউনিয়নে ও পূর্ব ইয়োরোপে সমাজতন্ত্রের সংকট দেখা না দিলে শমিতার ঢাকুরিয়ার রেলকলোনির এই মানুষজন সৌরাংশুর কাছে এত গুরুত্ব পেত না কখনোই। সমাজতন্ত্রের ধ্বংসস্তূপের ওপর দাঁড়িয়ে সৌরাংশু ও শমিতা দুজনেই এক আত্মচেতনায় পেঁছিন—বাস্তব আর মননের বৈষম্যের ভিতর থেকে উত্থিত পরাজিতের আত্মসচেতনতা, বাস্তবের সাযুজ্য থেকে সঞ্চারিত এক মানবিক আত্মসচেতনতা।

ঢাকুরিয়ার রেলকলোনির লোকজনের পরিসীমার ভিতর সেই আত্মসচেতনতা নিয়েই কথা বলে ওঠেন সৌরাংশু, 'তোমার এই লেখাগুলি পড়তে-পড়তে এদের একটা নাম মনে আসছিল—'

'কী স্যার?'

'এ-রকম সব কথাই ত আমাদের মাথায় ইংরেজিতে আসে, পরে আমরা তার বাংলা করে নেই। এতক্ষণ ভাবলাম, ভাল একটা বাংলা মনে এল না। অথচ ইংরেজিটা চট করে এল, তার অর্থের সব ব্যঞ্জনাসহ—জার্নি টুওয়ার্ডস আনসেলফকনসাসনেস্।'

কথাটা বুঝে নিয়ে একটু চুপ করে থেকে শমিতা বলে, 'আর-একবার বলুন স্যার।'

'ঐ আর-কি, তুমি কথা বলতে-বলতে বুঝছিলে-না, তোমার সমস্ত চেষ্টা ছিল তোমার ভাষা আর তার ভাষার অর্থ এক করার দিকে? তুমি যা-ভেবে যে-কথা বলছ, সে তার উল্টোদিকে চলে গেল ঐ কথাটাই নিয়ে! মানে, তোমার আর তার মধ্যে অর্থের কোনো সংযোগই নেই। কিন্তু সে-সংযোগ ত মূলত ছিল, তুমিও বাংলায় কথা বলছ সেও বাংলায় কথা বলছে, তাহলে তোমার অর্থ আর তার অর্থের মধ্যে এত পার্থক্য ঘটে গেল কেন? ঘটে গেল তার জীবনযাত্রা তার শব্দগুলিকে এক রকম অর্থ দিয়েছে, তোমার জীবনযাত্রা ঐ একই শব্দগুলিকে আর-এক রকম অর্থ দিয়েছে। তুমি তোমার অর্থ নিয়ে তোমার জ্ঞানের সীমা বাড়াতে চাও, সে তার অর্থ নিয়ে তোমার জ্ঞানের বিপরীতে চলে যেতে চায়।'

'স্যার এত চেষ্টা করলাম, কোনো সময়ের ধারণা আনতে পারলাম না।'

'ঐ যে একজন বলল, যখন যেখানে বাঁচি, তখন সেখানকার

কথাই মনে থাকে।'

'বললও ত তাই। এখনকার কথায় বা এখনকার বাঁচায় ত গোলমাল নেই কোনো। প্রত্যেকটা নিভুর্ল। টিভিতে কী হয়, কোন টিভি কখন চলে, কোন মাসিমা কখন চা খান, কখন কেন প্লেন যায়।'

'কত গভীরে, প্রায় তোমার ইয়ুঙ-এর যূথস্মৃতিতে ঢুকে আছে যে সাহেব ছাড়া কোনো কাজ হয় না আর সবাই বিলাতে যায় কাজ করতে। এমন-কি ওর স্বামীও যায়।'

'সেটা অবিশ্যি স্যার ওদের শব্দসংগ্রহের একটা পদ্ধতিও হতে পারে। আমি যে-কথাগুলো জিজ্ঞেস করছি সে-কথাগুলো ত ওর প্রতিদিনের ব্যবহারের কথা নয়। ফলে, আমার যে-কোনো শব্দকেই ও ব্যবহার করতে চায়। যেন ঐ শব্দটা ব্যবহার না করে কথাটার জবাব দেয়া যাবে না। একজনকে জিজ্ঞাসা করলাম পরাধীন দেশের কথা। সে বুঝল, পুরনো কোনো কথা জিজ্ঞেস করছি। বলল, পরাধীন ত ছিলই তার শবশুর। আসলে বোঝাতে চাইছিল শবশুরের সংসারে পেতিকাজের ওপর অকুলানের কথা।'

'তা হতে পারে কোনো-কোনো প্রশ্নের বেলায়। কিন্তু তুমি ত সময় বোঝার কত সঙ্কেত দিলে—পরাধীনতা-স্বাধীনতা, প্রধানমন্ত্রী, ইন্দিরা গান্ধী, ভোট, ঢাকুরিয়া ব্রিজ, পুরনো কথা, বাপের বাড়িতে পেট বেশি ভরত, না শবশুর বাড়িতে—এই একটি সঙ্কেতও ত সে নেয়নি। তুমি জিজ্ঞাসা করলে মথুরাপুরে চা খেতেন? সে জবাব দিল, চা খেতে ত চিনি লাগে। মানে মথুরা-পুরে ওদের বাড়িতে চিনি আসত না।'

শমিতা একটু চুপ করে থেকে মাথা ঝাঁকায়, এটা সে ভেবে দেখেনি। তারপর আস্তে বলে, 'এখনকার ব্যাপারে কিন্তু কোনো সঙ্কেত-টঙ্কেতের মধ্যে নেই। ক্যাটারারের খাওয়ার ধরণ এক-রকম। ঠিকেবাড়িতে বিয়েশাদি হলে বৌদি-মাসিমারা শাড়ি দেন। টাকাও দেন। রেট ছাড়া কি কোনো কাজ হয়?'

'কিন্তু সময় সম্পর্কে একটা জায়গায় একটা কথা বলেছে।'

'কোথায় স্যার?'

'না। সে-রকম স্পষ্ট করে নয়। কিন্তু এটা বুঝিয়ে দিয়েছে সে

জানে সময়টা ঘুরে-ঘুরে আসে না, চলেই যায়। দারুণ কথা বলেছে একটা।'

মনে আনার চেষ্টা করল শমিতা কিন্তু পারে না। হেসে জিজ্ঞেস করে, 'কোন কথাটা স্যার।'

'তুমি এক জায়গায় প্রায় আত্মসমর্পণ করে বললে-না যে এত ত কথা হল কিন্তু কতটা সময় আপনাদের জীবনে কেটেছে তা নিয়ে ত কিছু বললেন না, তখন তিনি বললেন, একটা লোকের সারা জীবনের চাইতেও বেশি —। কী দারুণ কথাটা বলেছেন! তোমাকে জানিয়ে দিলেন সময়ের যে-একটা হিশেব আছে সেটা তিনি জানেন কিন্তু সময় তাঁর পক্ষে এমন বাঁচামরার ব্যাপার যে হিশেব রাখার সময় তিনি সারা জীবনেও পাননি। যে ডাস্টবিন ঘেঁটে খাবার যোগাড় করে খিদে মেটায় তাকে কি তুমি জিজ্ঞাসা করতে পারো আজকে তোমার খাবার মেনু কী কী ছিল। মানুষ বেছে-বেছে রান্না করে খায় এটা তারও জানা। কিন্তু তার খাবার সময় সে-হিশেব রাখা অসম্ভব, অবান্তর। কী কঠিন বাঁচা শমিতা, সময়কে ভুলে, জীবনকে ভুলে?'

'তাহলে স্যার, ঐ বিশ্বাসগুলো আঁকড়ে থাকে কী করে? বাচ্চা হওয়ার ব্যাপারে পুরুষই প্রধান, পুরুষ না হলে পেটে বাচ্চা আসতে পারে না, মেয়েরা প্রসব ঠেকাতে পারে না, মেয়েদের শরীর তৈরি হয়েছে সন্তানধারণের জন্যে, সন্তান না হওয়া পাপ? আমি জিজ্ঞেস করলাম আপনি বাচ্চা চেয়েছিলেন, আর তাতে রেগে উঠে বলল, চাওয়া-চাওয়া বলেন কেন, একি রুটি চেয়ে খাওয়া? কী অহঙ্কার, মেয়ে বলে।'

সৌরাংশু চুপ করে থাকেন, জানলার দিকে একবার তাকান, সেখানে বিকেলের ছায়া অনেকটা ছড়িয়েছে আর সেই ছায়া থেকে এই চৈত্রের গরমের ওপর খানিকটা স্বস্তি ছড়িয়ে পড়েছে। সৌরাংশু প্রথমে হাতটা ঘুরিয়ে দেন, তারপর শমিতার দিকে মুখ ঘুরিয়ে বলেন, হেসেই, 'কী জানি।'

'এই একটা সময়ই কিন্তু খানিকটা যেন রেগে উঠল। সবারই যে এ-রকম হয় তা নয়। আমি ত আরো অনেকের সঙ্গে কথা বলেছি। তারা ত বেশ স্পষ্ট বলেছে—বেশি ছেলেপুলে হলে

খাওয়াবই-বা কী করে। তারা ছোট পরিবারের দরকারটা খুব ভাল জানে। দু-একটি পরিবারের বাচ্চা তো রিকশা ভ্যানে চড়ে ইউনিফর্ম পরে স্কুলেও যায়। অথচ এরই মধ্যে এমন দু-একজনের সঙ্গে দেখা হয়ে গেছে যারা এ-রকম কথা বলে। স্পষ্ট, কোনো দ্বিধা নেই। মেয়েদের শরীর তৈরি হয়েছে বেশি বাচ্চার জন্যে। বাচ্চা না হলে শরীর নষ্ট হয়ে যায়। বাচ্চা না হওয়াটা দোষের। যেন এটা ইচ্ছা-অনিচ্ছা নিরপেক্ষ বৃষ্টি পড়া বা রোদ ওঠার মত ব্যাপার—তাতে কোনো ব্যতিক্রম এদের সইবে না।'

কথাটা শুনে সৌরাংশু শমিতার দিকে তাকিয়ে থাকেন। শমিতা এই তাকিয়ে থাকার অর্থ বোঝে—সৌরাংশু কিছু ভাবছেন, এবার কিছু বলবেন। শমিতা স্যারের সেই চিন্তাসম্ভব দৃষ্টির সঙ্গে কিছুক্ষণ দৃষ্টি বিনিময় রাখে, তারপর নিজের চোখটা নামিয়ে সৌরাংশুকে আরো একা করে দেয়।

একটু পরে সৌরাংশু যেন নিজেই তাঁর চিন্তার একাকিত্ব ঘোচাতে জানলার দিকে মুখ ফেরান। তারপর সেই বিকেলের দিকে তাকিয়েই বলেন, 'যারা বলছে তাদের কম ছেলেমেয়ে দরকার তাদের বেলায় আমাদের কোনো প্রশ্ন নেই। কিন্তু যারা বলছে তাদের শরীর বেশি ছেলেমেয়ের জন্যে তৈরি, তাদের বেলায় আমাদের প্রশ্ন আছে। কেন? আমাদের সেই প্রশ্নের যাথার্থ কোথায়?'

স্যারের স্বরের মগ্নতা বাধাগ্রস্ত না করে, একটু বিরতি দিয়ে শমিতা যোগ করে, 'দুদিক থেকে স্যার। এক, যে-সময়ে আমরা বাঁচছি, আছি, সে-সম্পর্কে কে কতটা সচেতন তা এই প্রশ্নের উত্তর থেকে বোঝা যায়। দুই, জীবনযাপন সম্পর্কে বাস্তববোধও ত বোঝা যায়।'

'হ্যাঁ। কিন্তু যে-মেয়েটি জন্মনিয়ন্ত্রণ করতে চায় না, সে-মেয়েটিকে তুমি পেছিয়ে থাকা বা অজ্ঞান ধরে নিচ্ছ কেন?'

'তার চিন্তা বা কাজের মধ্যে সঙ্গতি নেই বলে। সে তার গ্রাম ছেড়ে শহরে এসেছে বেঁচে থাকার জন্যে কিন্তু সংসার ছোট রেখে বাঁচার অন্য বিকল্পটা ভাবছে না।'

'ভাবছে না নয়, সে ঐ অন্য বিকল্পটাকে প্রত্যাখ্যান করছে।

প্রথম বছর তার ছেলেপিলে হয়নি কেন, সে জানে। প্রথম ছেলে হওয়ার পর আর ছেলেপিলে হয়নি কেন, তাও জানে। সে গ্রাম ছেড়ে শহরে এসেছে বাঁচার জন্যে। কিন্তু বাঁচা মানে তার কাছে সন্তানের জন্ম দেওয়ার ভূমিকা অস্বীকার করা নাও হতে পারে। তার মত করে এটা সচেতন প্রত্যাখ্যান হতে পারে।'

স্যারের যুক্তির প্যাঁচটা শমিতা মনে-মনে বুঝে নিতে চায়। স্যার যে-ভাবে কথাটা তুললেন তাতেই বোঝা যায় এ-রকম একটা যুক্তি দিয়ে মেয়েটিকে সমর্থনমাত্র তিনি করতে চাইছেন না, তিনি মেয়েটির কাজের একটা অন্য ধরণের সঙ্গতি খোঁজার চেষ্টা করছেন, কিন্তু শুধু যুক্তিতে নয়।

'ধনতন্ত্রের অপ্রতিহত ক্ষমতা আর গতিতে একদিন এটাই সবাই জেনে গিয়েছিল, সারাটা দুনিয়াই ইয়োরোপ হয়ে যাবে। তা থেকেই ত অর্থনৈতিক মানব, ইকনমিক ম্যানের নেতৃত্বে পৌর-জীবনের ধারণা তৈরি হয়েছে। কিন্তু শেষ পর্যন্ত ত দুনিয়াটা ইয়োরোপ হয়ে যায়নি, বড় জোর, দুনিয়াটা ইয়োরোপের হয়ে গেছে। আর, ইয়োরোপের ইকনমিক ম্যানের নেতৃত্বে দুনিয়ার সর্বত্র পৌরজীবনও তৈরি হয়নি। আমার ত মনে করতে ইচ্ছে করছে, যদিও জানি সেই মনে করাটাও বানানো হবে, ভুল হবে— তোমার যে মেয়েটি বলেছিল আমার শরীর সন্তান দিতে পারে, তাই যত পারি সন্তান দেব, সে আসলে এই ইকনমিক ম্যান অর্থাৎ যা কিছু করব তা আমার আর্থিক উন্নতির জন্যে করব এই তত্ত্বটাকেই প্রত্যাখ্যান করছে। এখন ত আমরা জেনে গেছি পৃথিবীর বেশির ভাগ দেশেই, ইয়োরোপের বাইরে, ঐ পৌরজীবন তৈরিই হয়নি।'

'আপনার কথাটা স্যার ইতিহাসের দিক থেকে হয়ত কিছুটা ঠিক, বা, এই নিয়ে হয়ত কথা চলতে পারে। কিন্তু আমরা ত এখানকার অবস্থাটা বুঝতে চাইছি। ধনতন্ত্র আর কলোনিবিস্তারের সময় যে-পৌরজীবন তৈরি করে তুলতে পারেনি, এখন কলোনি উঠে যাওয়ার পর এই স্বাধীন দেশগুলিই ত সেই পৌরজীবন তৈরি করার জন্যে উঠে পড়ে লেগেছে, যার নায়ক ইকনমিক ম্যান, যে শুধু নিজের আর্থিক উন্নতিটুকু বোঝে। দুনিয়াটা ইয়োরোপের

যখন আর নেই তখনই ত দুনিয়াটা ইয়োরোপ হয়ে উঠছে।'

সৌরাংশু একটু হাসেন। সেই হাসিতে শমিতার যুক্তি মেনে নেয়ার ইঙ্গিত থাকে। কথাটা যেন এখানেই শেষ হয়ে গেল—তাদের দুজনের নীরবতায় সে-রকমই মনে হয়। কিন্তু নীরবতাটা যে ভাঙে না তাতেই আবার বোঝা যায়, কথাটা বোধহয় শেষ হয়ওনি, বা কথাটা অন্য দিক থেকে শুরু হতে পারে।

শমিতাই বলে ফেলে, 'এই মেয়েটিই ত ইকনমিক ম্যান? সেই এসে প্রথম কাজ জোগাড় করেছে, তার স্বামী ত পরে কাজ পেয়েছে, সে প্রত্যেকটা কাজ রেট দিয়ে হিশেব করে, সে তার প্রত্যেকটা পয়সা আয় করে, আয়ের হিশেব জানে—'

'তাতে কী হল?'

'কিন্তু তার ধারণার এই একটা জায়গায় সে ত তার এই টাকা-পয়সার হিশেব দিয়ে চলছে না, সে তার ধারণা দিয়েই চলছে।'

'ধরো যদি ধরে নিই যে মেয়েটির এই ধারণা প্রাক্-ধনতন্ত্রের ধারণা, যদিও তা নয়, কারণ শীতের দেশে জন্মের হার কম বলে ওরা জন্মনিয়ন্ত্রণকে সব সময় ধনতন্ত্রের পক্ষে কার্যকর ধারণা মনে করে না, কিন্তু যদি ধরেও নিই, তাহলেই-বা কী এসে যাচ্ছে।'

'কিছু এসে যাচ্ছে না, কিন্তু আপনি যে রকম বলছিলেন মেয়েটি ইকনমিক ম্যানের ধারণাটাই প্রত্যাখ্যান করছে, তাও হয়ত নয়।'

'নয়ই ত। এই কথাটাই ত আমরা ভুলে থাকি। ধনতন্ত্রের অপ্রতিহত যাত্রা সত্ত্বেও লক্ষ-লক্ষ কোটি-কোটি মানুষের মধ্যে প্রাকধনতন্ত্রের সব বন্ধন, মনের বা কাজের, ঘুচে যায়নি, যাবে না। হয়ত এটা কলোনিবিস্তারের পর্বের পক্ষে সম্ভবও ছিল না। তুমি ঠিকই বলেছ, এটা হয়ত এখন সব স্বাধীন দেশে সম্ভব হয়ে উঠছে। কিন্তু ঐ মেয়েটির কথায় বা আচরণে কোথায় স্ববিরোধিতা আছে সেটা খুঁজে কোনো লাভ নেই। বাস্তব অবস্থাটা কী সে-বিষয়ে আমাদের ধারণার মধ্যে কোথায় স্ববিরোধিতা—সেটাই বোধহয় বেশি করে দেখতে হবে। মুশকিলটা কী জানো শমিতা? পুঁজি জমালেই ত আর ধনতন্ত্র হয় না, পুঁজি না জমালেও সমাজতন্ত্র

হয় না। আমাদের দেশে গত চল্লিশ বছরে জনসংখ্যার মাত্র তিরিশ শতাংশকে ধনতন্ত্রের কব্জায় আনা গেছে। বাকি সত্তর শতাংশ, এখন ধরতে পারো সত্তর কোটি মানুষই, এই সব কিছুর আওতার বাইরে। কিন্তু মজাটা হচ্ছে ভারতবর্ষের জনসংখ্যার এই তিরিশ শতাংশই মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের বা সোভিয়েত ইউনিয়নের মোট জনসংখ্যার প্রায় সমান। আর তাতেই ত তোমার ধনতন্ত্র যে ধনতন্ত্রই তা স্বীকৃত হয়ে যায়। এ সবই ত আসে ঐ একটা চিন্তা থেকে—মানুষের ইতিহাসে ধনতন্ত্র একটা অনন্ত শক্তি। এই ধারণা থেকেই তৈরি হয়েছে—টেকনোলজির আর আর্থিক উন্নয়নের ধারণা। অথচ মার্ক্স তাঁর ক্রিটিকে ইতিহাসে ধনতন্ত্রের স্থায়িত্বের ধারণাটাকেই সবচেয়ে বেশি আক্রমণ করলেন।'

একটু থতমত খেয়ে থমকে থেমে যান সৌরাংশু। তাঁর প্রায় মুখে এসে গিয়েছিল—ক্রিটিকের প্রিফেসের সেই উক্তি—ধনতন্ত্রের অবসানে মানুষের প্রাগেতিহাসের অবসান।

পাঁচ

না, শমিতা, আমার ভিতর কোনো বিনিয়যোগ্য উদ্বৃত্ত নেই। ইতিহাস যখন নিঃশেষ করে তখন নিঃসীম করেই নিঃশেষ করে।

ফ্যাকাল্টি ক্লাব থেকে বেরিয়ে, শুকনো পাতা মাড়িয়ে-মাড়িয়ে ঝোপঝাড় ঝিলের পাশ দিয়ে একটু মেঠো রাস্তা পেরিয়ে-উতরিয়ে, বিকেলে ঝিলে জলকম্পনের দিকে একটু তাকিয়ে-তাকিয়ে সৌরাংশু বিশ্ববিদ্যালয়ের গেট পর্যন্ত বিনা বাধায় পেঁছে যেতে পারেন, যেমন পেঁছতে চেয়েছিলেন, যেন ফ্যাকাল্টি ক্লাবের বড় জানলা দিয়ে দক্ষিণের আকাশে বিকেলের মেঘের রৌদ্রহীনতা, জলের ওপর কিছু নুয়ে পড়া একটি ডাল, জলের ওপরের শূন্যতা দিয়ে শুকনো একটি পাতার উড়ে যাওয়ায় একাকিত্বের যে-ছলনা থেকে থাকে তা এপ্রিলের গোড়ার এই দিনটির শেষে সৌরাংশুর পক্ষে আর ছলনা ছিল না। নেহাতই এই সব তুচ্ছাতিতুচ্ছ কারণে যে-বিকেল একটু বেশিই গড়িয়ে গিয়েছিল, বিশ্ববিদ্যালয় অনেকটাই ফাঁকা, যে-সব ছাত্রছাত্রী তখনো ফেরেনি তারা ঝোপঝাড় গাছগাছালির আড়ালে ঝলসানো মুখের প্রলেপ চাইছে, একটিই মাত্র বাতাস গেট থেকে সৌরাংশু পর্যন্ত দৃশ্যমান থাকতে ও সৌরাংশুকে পেরিয়েও বয়ে যেতে পারে, ডানহাতি এঁদো ডোবার পাশে নিহত উপাচার্য গোপাল সেনের মর্মরস্মৃতিস্তম্ভ ঘিরে সবুজ লতানে ঘাস লিকলিকায়।

শমিতা চলে যাবার পর তিনি ফ্যাকাল্টি ক্লাবে যান। তখনই মনে হচ্ছিল—অনেক কথা বলে ফেললেন শমিতার সঙ্গে, যা হয়ত না বললেও চলত, সৌরাংশু তাঁর কোনো সহকর্মীর সঙ্গে হয়ত এত কথা বলতেন না। হয়ত নয়. বলতেনই না। শমিতার সঙ্গে এত পর

পর দেখা হয় বলেই কি এত কথা উছলে উঠল ? নাকি, শমিতার ঐ ইণ্টারভিয়ুগুলির ফলে ? অথবা, শমিতাকে তিনি বলতে চাইছিলেন তাঁর আত্মজীবনী, যা শেষ পর্যন্ত বলেননি। তাঁর আত্মজীবনীতেই তাঁর স্বীকারোক্তি আছে। কখন এক সময়ে যেন শমিতার সঙ্গে কথাবার্তা অন্য দিকে চলে গেল। সে-সংলাপে সৌরাংশু শুধু ভাঙতে পারলেন—নিজের যুক্তিকাঠামো, অর্থনীতির যুক্তিকাঠামো, দর্শনের যুক্তি-কাঠামো। সেটাও ত তাঁর আত্মজীবনীর অংশ, তাঁর স্বীকারোক্তি। তা হলে কি একরকম করে বলা শুরু হয়ে গেছে, এক নিরর্থক বাচালতায় ? সৌরাংশু কি সমাজতন্ত্রের আর মার্ক্সবাদের সংকটের মত ঘটনাকে নেহাত এই ব্যক্তিগতে নামিয়ে আনতে চান ? যেহেতু তিনি ছাত্রজীবনে কমিউনিস্ট পার্টিতে ছিলেন, জেল খেটেছেন, পুলিসের মার খেয়েছেন, জেলে বসে মার্ক্সবাদ পড়েছেন, মার্ক্সবাদ পড়ার জন্যেই অর্থনীতি পড়েছেন, জেলে থেকেই পরীক্ষা দিয়েছেন, সেই কারণে মার্ক্সবাদ আর সমাজতন্ত্রের সংকট তাঁর পক্ষে একটু বেশি সংকট ? সৌরাংশু নিজের স্বীকারোক্তির হাত থেকে নিজেকে রক্ষা করতে চাইলেন, এখন ! না, তাঁর কোনো স্বীকারোক্তি নেই। সেদিক থেকে তাঁর কোনো আত্মজীবনীও নেই।

ফ্যাকাল্টি ক্লাবে গিয়েছিলেন কিছু খেয়ে নেবেন বলে। কিন্তু সেখানে গিয়ে দেখেন প্রায় প্রদর্শনী চলছে। ইঞ্জিনিয়ারিঙের কোনো অধ্যাপক স্টেটসে গিয়েছিলেন। সেখানে বার্লিন দেয়ালের ভাঙা টুকরো বিক্রি হচ্ছে। মোটা পিসবোর্ডের একটু লম্বাটে বাক্স, ওষুধের বাক্সের মত। তার ওপর বড়-বড় হরফে ছাপা 'খাঁটি ও আসল বার্লিন দেয়ালের টুকরো।' আরো কী সব লেখা আছে—পাশে একটা গভীর নীল শাটিনের কাপড়ের ছোট্ট ঝোলার ভিতর সেই পাথরের টুকরো। টেবিলের ওপর রাখা ছিল। পৃথিবীর যে-কোনো কংক্রিট ভাঙলে ঐ-রকম টুকরোই পাওয়া যাবে। সৌরাংশু এক ঝলক দেখে সরে গিয়েছিলেন। যদি জানতেন ওখানে ঐ পাথরের টুকরোটা আছে তা হলে ঐ একঝলকও দেখতেন না।

কিন্তু তিনি সরে এলেও তাঁকে বসে-বসে সারাক্ষণ দেখতে হল ঐ পাথরটা দেখার জন্যে ভিড়টা কেমন বেড়ে উঠছে। লাইন হচ্ছে না ঠিকই কিন্তু একজন হাতে তুলে দেখছিল বলে অনেকে বেশ

চিৎকার করে উঠল, 'টেবিলের ওপর থাকলে ত সবাই দেখতে পাবে, কেন, মিছিমিছি, হাতাহাতি করছেন।' এরপর ভিড়টা আরো শৃঙ্খলাবদ্ধ ও কৌতূহলী হয়ে ওঠে, যেন সত্যি তারা একটা ঐতিহাসিক ঘটনার সাক্ষ্য দেখছে। প্রায় একটা লাইন হয় আর কি!

সৌরাংশু খানিকক্ষণ বসেন, একটা কফি আর এক পিস টোস্ট দিতে বেশ সময় লাগল। ভাবলেন, উঠে আসবেন। কিন্তু উঠে এলে আবার ছেলেটি তাঁকে খোঁজাখুঁজি করবে। তা ছাড়া, কোনো-কোনো অধ্যাপক ত তার টেবিলে এসেই গেলেন। তাঁকেও ত বার্লিন দেয়ালের টুকরো নিয়ে একটু-আধটু কথা হাসিমুখেই শুনতে হল। এমন-কি এমন রসিকতাও, 'কলকাতায় সি. পি. এমের বার্লিন দেয়াল কী হতে পারে?'

নিজের শরীর দিয়ে সৌরাংশু বুঝতে পারছিলেন, এখন, কোনো কথা, যে-কোনো কথা, বলতে গেলে তাঁর গলা ধরে আসবে, নাক বন্ধ হয়ে আসবে, চোখ ছলছলিয়ে উঠবে ও খুব সাবধান না হলে চোখের জলের ফোঁটা গড়িয়েও নামতে প্যারে। এ-রকম সময়ে সিগারেট খুব সাহায্য করে। প্রথম টানটা পর্যন্ত যেতে পারলে চোখের জলটা আটকে দেয়া যায় আর স্বরের শ্লেষ্মার জটিলতা ধোঁয়ার সঙ্গে মিশে যায়। সৌরাংশু বোঝেন, খিদেয় তাঁর পেট ভিতরে ঢুকে গেছে, গলা শুকিয়ে গেছে, কোনো সাবালক মানুষের এত খিদে ও এত তেষ্টা পাওয়া ঠিক নয় কিন্তু সৌরাংশু বাড়িতে পৌঁছনোর আগে দাঁতে কিছু কাটবেন না। আর বিকেলে-সন্ধ্যায় সৌরাংশুর ফেরার সময় যেহেতু ঠিক নেই, বাড়িতেও হয়ত কেউ তাঁকে চা-ই দেবে এককাপ কিন্তু সৌরাংশু ইচ্ছে করেই কিছু চাইবেন না। সৌরাংশু তাঁর শরীরের অভিজ্ঞতায় বোঝেন, তাঁর ব্লাডপ্রেশার সম্ভবত এখন ৯৫/১১৫। ভিতরে-ভিতরে তাঁর শরীরটা যখন এত নিঃস্ব হয়ে যায় তখন তাঁর প্রেশার এ-রকমই থাকে। শারীরিক এমন নিঃস্বতার অভিজ্ঞতা যখন শুরু হয়েছিল তখন সৌরাংশু মাঝেমধ্যে পরীক্ষা করে দেখেছেন—এই খিদের সূচনাতেই মাংস-রুটিটুটি দিয়ে ভরপেট খেয়ে নিলে তাঁর অস্বস্তি হয় বটে কিন্তু খাওয়ার প্রায় সঙ্গে-সঙ্গে শরীরটা চনমনে

হয়ে যায়। এটা জানা হয়ে যাওয়ার পর এমন খিদের সময়ও সৌরাংশু খেতে চান না। তাঁর প্রেশার ৯৫/১১৫ হয়ে গেছে জেনেও খেতে চান না। ধীরে-ধীরে ধীরে-ধীরে খাওয়াটা কেমন তাঁর অভ্যেসের বাইরে চলে যাচ্ছে। তার চাইতে বরং এইটিই তাঁর অভ্যস্ত লাগছে—এই আকণ্ঠ তৃষ্ণা, এই আমূল খিদে, এই পাঁজরে ব্যথা আর এই হাঁফিয়ে ওঠা। সৌরাংশুর ত নিজেকে কষ্ট দেয়ার বিকার নেই। কিন্তু খাওয়ার মত ইন্দ্রিয়ঘন ঘটনাকে যুক্তি দিয়ে খাওয়ার মত বর্বরতায় নিয়ে আসতে পারবেন না—তা যতই কেন না সৌরাংশুর নিজেরই দোষে তাঁর না-খাওয়াও একটা যুক্তি হয়ে দাঁড়াক।

গেটের কাছে এসে একটু দাঁড়ান সৌরাংশু। গেটটা আজকাল বন্ধই থাকে। একজন গলে যাওয়া যায়, গাড়িটাড়ি যেতে পারে না। গেটটা পেরিয়ে বাইরে গিয়ে একটু দাঁড়ান। ডাইনে তাকালে ফাঁড়ির মোড়ের দিকে ম্যাকাডামের কাল শীতলতা আর পূবমুখো বাড়িগুলোর ছায়াময়তা। অ্যাসোসিয়েশনের বড়-বড় গাছগুলো বিকেলে যেন ঝাঁকিয়ে উঠল। সৌরাংশু দেখেন, মানুষজনের মুখে চৈত্রের ঝলক। প্রকৃতিতে তেমন কোন ঝলসানো নেই। গত কয়েকদিন রোদ খুব চড়েছে। এর ভিতর মার্চের শেষ থেকে বিকেলের সেই ঝড়ো বাতাস বইছিল। এপ্রিলে একটা মাত্র কাল-বৈশাখী হয়েছে তারপরই বাতাসটা বন্ধ হয়ে গেছে। অথচ রোদটা আরো খাড়া হয়েছে। সৌরাংশু বড় একটা ঘামেন না, গরমে বরং তাঁর ভঙ্গুর শরীরটা একটু ভাল থাকে। কিন্তু এখন বোধহয় তিনি তাঁর নিজের শরীরটাকে আর রক্ষা করতেও চাননা তেমন। খিদেয় তাঁর পেটব্যথা শুরু হবে আর-কিছুক্ষণের মধ্যেই। এখন যদি কিছু খানও, সেই খাদ্যই তাঁর শারীরিক অস্বস্তির কারণ হবে। একটু জল খাওয়া যেত হয়ত—কিন্তু কোথায় শুধু এক গ্লাস জল চাইবেন?

সৌরাংশু গেটের উল্টোদিকের ছায়াচ্ছন্ন বৈকালিক পথটার দিকে তাকিয়ে ডাইনে-বাঁয়ে একবার দেখে নিয়ে রাস্তাটা পেরন কিন্তু বাসস্ট্যান্ডে দাঁড়ান না, সোজা হাঁটতে থাকেন, যেন একটু এগিয়ে বাস ধরতে চান, বা তাঁর এই ক্ষুধাতৃষ্ণার শরীর নিয়ে একটু

একলা হাঁটতে চান।

ফ্যাকাল্টি ক্লাব থেকে বেরিয়ে আসার সময় ভেবেছিলেন, বরং বাড়ি ফিরে যাবেন, তা হলে 'কাজ' করতে হবে না। কিন্তু সৌরাংশু জানতেন, বহুদিনের পুরনো মিস্ত্রির যন্ত্রের অভিজ্ঞতায় জানতেন, বাড়িতে 'কাজ' করতে হবে না বলেই বিছানায় এলিয়ে পড়বেন আর শরীরের কোন গভীর থেকে এক নিরর্থকতা তাঁকে চেপে ধরবে। যদি পেটভরে কিছু খেয়ে নেন, তাহলে হয়ত একটু আচ্ছন্নতা আসবে, বেঁচে যাবেন। কিন্তু আজকাল আর অত নিশ্চিতভাবে বলাও যায়না যে বেঁচে যাবেন। শুয়ে-শুয়ে-শুয়ে গভীরতর ও অপ্রতিরোধ্য এক নিরর্থকতায় ডুবে যেতেও পারেন, গলার কাছটা ভারী হয়ে আসবে, বাঁ দিকের বুকের এদিক-ওদিক ব্যথা করবে, চোখদুটো কারণহীন জলে ভরে উঠবে, কানের পাশ দিয়ে জলের রেখা বইবে, শুকিয়ে যাবে। অশ্রুপাত যদি না থামে, তা হলে তাঁকে বাথরুমে গিয়ে কিছুটা অশ্রুত্যাগ করে আসতে হবে। এখান থেকে তাঁর বাড়ির দূরত্ব এখন বাসে অন্তত ঘণ্টা-খানেক, ট্যাক্সি নিলেও আধঘণ্টা। সেই দূরবর্তী সম্ভাব্য কান্নার ভবিতব্যতায় এখনই তার গলা ভারী হয়ে আসছে। একে কি কান্না বলা যায়—যা শুধুই এক শারীরিক রেচনক্রিয়া, যার সঙ্গে মনের কোনো যোগ নেই?

কিন্তু পেটটা ভরা থাকলেই সেই প্রক্রিয়া আর কাজ করে না। খাওয়া আর শরীর নিয়ে এমনি নানা সমস্যা ত সারা জীবন ধরে পাকিয়ে তুলেছেন—কৈশোরের অনিশ্চয়তা, দেশভাগ, বাবার অনিশ্চিত আয়, সংসার কী ভাবে চলবে বা সংসারের কী হবে সেই নেহাত প্রতিদিনের সমস্যার সঙ্গে সমাজের কী হবে, দেশের কী হবে সেই দূরবর্তী পরোক্ষ ইতিহাসকে এক করে দেখা, জেলখাটা, শরীরের জোরে বা বয়সের জোরে যা সইত এখন তার প্রতিক্রিয়া সারা শরীরে। পেট খালি রাখতে ডাক্তার নিষেধ করেন, কী দিয়ে পেট ভরাবেন তা ডাক্তার ঠিক করে দিতে পারেন না। একবার খিদে পেয়ে গেলে কোনো খাদ্যই পেট গ্রহণ করে না। আর, খিদে পাবার আগে কী খাওয়া হবে তা বহু পরীক্ষাতেও সাব্যস্ত হয়নি। এমন-কি বিস্কুট বা সন্দেশও তাঁর পক্ষে সবসময়

নিরাপদ নয়। এত সাবধানতা থেকে খাওয়া সম্পর্কে একটা উদাসীনতা, যা হয়ত আসলে ঘৃণাই, তাঁর ভিতরে কোথাও সেঁদিয়ে গেছে। আর, এখন ত বটেই। যে-অশ্রুমোচনের একমাত্র প্রতিষেধক পেটভরানো, সেই আমিষাশী অশ্রু বরং চোখ দিয়ে গড়াক। পেট দিয়ে চোখ ঢাকতে চান না সৌরাংশু।

তাই ভেবেছিলেন, ফ্যাকাল্টি ক্লাব থেকে বেরিয়ে একটা বাস পেয়ে যাবেন আর ফাঁকাও পেতে পারেন। আজকাল এবং হঠাৎই, তাঁর চারদিক বড় নির্জন ঠেকে। কথা বলার লোক হু হু কমে আসছে। অথবা, সৌরাংশুই সবার কাছ থেকে হু হু বেগে সরে আসছেন। তাই নিজের কাছেই রসিকতা করে যেতে হয়, নিজের রসিকতা নিজেকেই মনে রাখতে হয়। এক বেশ অভিজ্ঞ, পুরনো ডাক্তার, তাঁরও ছাত্রজীবনের রাজনীতি থেকে জেলখাটা, জেলে বসে পড়াশোনা, জেল থেকে বেরিয়ে আবার পড়াশোনা, শেষে অবিশ্যি বিদেশ থেকেও বিশেষজ্ঞ হয়ে আসেন, সৌরাংশু তাঁকে 'দাদা' বলেই ডাকেন, বলেছিলেন, 'বেশির ভাগ ভারতবাসীর যা সমস্যা, তোমারও তাই। বাড়তি বয়সে, যৌবনে, যা খাওয়ার তা খাওনি বা পাওনি। পেটের ফ্লোরা-ফনা শেষ হয়ে গিয়েছে। তোমার সমস্যাটা পুষ্টির। কিন্তু সেটা ত অন্তত পঞ্চাশ বছরের পুরনো অসুখ। সুতরাং এই নিয়েই চালাও।' সৌরাংশু বলেছিলেন, 'অন্তত দেশ-বাসীর সঙ্গে এই একটা বিষয়ে এক হয়ে থাকতে পারলাম।'

পথটা পেরিয়েও সৌরাংশু হাঁটতেই লাগলেন, থামলেন না। তিনি নিজেও ঠিক বুঝে উঠতে পারলেন না, বা, ভাবলেন না, এই হেঁটে চলাটা চৈত্রবিকেলের স্নিগ্ধতা দেখে, নাকি, বহু পুরনো মিস্ত্রির অভিজ্ঞতায় তিনি সারাদিনের নিরর্থকতার ক্লান্তিকে আরো ক্লান্তির নীচে চাপা দিতে চান?

বরাবর, গত পঁয়ত্রিশ বছরের মধ্যে ত্রিশ বছরই ত এই কাজ করে আসছেন—ছেলেমেয়েদের পড়ানো, পি.এইচ.ডির ছাত্রদের সঙ্গে কথা বলা, নিজের লেখালেখি, অন্যের লেখা পড়া। এই ত বরাবর তাঁর কাজ, এখনো, কিছুই বদলায়নি। কিন্তু এখন এই কাজটাকেই এত নিরর্থক মনে হচ্ছে কেন? বা, এখন এই এত অভ্যস্ত কাজটাতেই কেমন দিশেহারা বোধ করছেন! সকালে ক্লাশে

কেমন অনিশ্চিত লাগল। শমিতার লেখাগুলো পড়তে-পড়তে খুব ভাল লাগছিল আর কোথা থেকে শমিতা সম্পর্কে একটা প্রত্যাশা তৈরি হয়ে উঠেছিল। তারপর শমিতার সঙ্গে কথা শুরুর আগে এই কথাটা ভাল ভাবতে পেরেছিলেন—মার্ক্সকথিত 'সঙ্কট-কালেই ধনতন্ত্রের একমাত্র আত্মসমালোচনার ইচ্ছে হয়'—এর সূত্রে সৌরাংশু তখন আপন মনে যোগ করেছিলেন, ভারতবর্ষে সেই কাজটা মার্ক্সবাদীরাই করে দেয়। কিন্তু আগে হলে যেমন এই নিয়ে একটা নিবন্ধের কথা ভাবতেন, এখন আর সে-রকম ভাবেন না। বরং, কথাটা যেন ভুলেই যেতে চান। সৌরাংশু যেন ভুলতে চান—শমিতার সঙ্গে আজ ক্লাশের পর থেকে তাঁর একটা গভীর বিনিময় চলছিল। এখন, সৌরাংশু হাঁটছেন। সৌরাংশু এখন অন্তত এটুকু বোঝেন, তাঁর কাছে আর বিনিময়যোগ্য কিছু নেই। সেটা তাঁর ব্যক্তিগত শূন্যতার চাইতেও অধিক। নদী গতিপথ বদলালে চড়া পড়বেই। সৌরাংশু এখন চড়া। ইতিহাস গতিমুখ বদলেছে—সোভিয়েত-চীন থেকে, অন্তত সৌরাংশুর জীবৎকালের জন্য। সৌরাংশু অন্তত এটুকু মার্ক্সবাদী থেকে যেতে চান—তাঁর মৃত্যুর পরেও ইতিহাসের জয় হবে এমন কোনো উপকথা তিনি রটাবেন না। তাঁর মৃত্যুর পরে ইতিহাসের জয় হতে পারে, পরাজয় হতে পারে, তাতে সৌরাংশুর কোনো নিয়ন্ত্রণ থাকবে না। ইতিহাস বলতে সৌরাংশুরা যা বুঝতেন সেই পাঠ ভুল প্রমাণ হয়ে গেছে। সৌরাংশুর জীবৎকাল সংশোধনের অতীত সেই ভুল পাঠ।

সংশোধনের এতটাই অতীত যে এই ইতিহাসের পাঠ কবে থেকে ভুল তার হিশেবটাও তাঁর পক্ষে এখন অবান্তর। অবান্তর, অপ্রাসঙ্গিক, বাচালতা। মূর্খতাও অনেকখানি। লেনিন ঠিক মার্ক্স বুঝেছিলেন কিনা, ১৯১৭ সালে, বলশেভিকদের ক্ষমতা দখল করা উচিত ছিল কি না, নেপ যুক্তিযুক্ত ছিল কি না, স্তালিন যুক্তিযুক্ত ছিল কি না, নাৎসি-সোভিয়েত চুক্তি যুক্তিযুক্ত ছিল কি না, নিস্তালিনীকরণ ঠিক কি ভুল ছিল, হাঙ্গেরি-চেকোশ্লোভাকিয়া ঠিক কি ভুল ছিল, ব্রেজনেভ ঠিক কি ভুল ছিল, গর্বাচেভ ঠিক কি ভুল—এ-সব সৌরাংশুর কাছে বাচালতা, বাচালতা। কারণ যে-ইতিহাসের প্রসঙ্গসূত্রে এই প্রশ্নগুলি উঠতে পারে, সেই ইতিহাসই সৌরাংশুদের

জন্যে বাতিল হয়ে গেছে। সৌরাংশু অন্তত মার্ক্সের কথা অনুযায়ী মার্ক্সবাদী থেকে যেতে যান—'ভবিষ্যতের জন্যে যে কর্মসূচি বানায় সে আসলে প্রতিক্রিয়াশীল।' সৌরাংশু অন্তত ভবিষ্যতের জন্যে কোনো কর্মসূচি বানাতে পারবেন না। তৃতীয় দুনিয়া থেকে নতুন বিপ্লবের নতুন আলো পথ দেখাবে, দেখাক। ভাল। সৌরাংশু সেই তৃতীয় দুনিয়ায় নেই, বিপ্লবে নেই, আলোতে নেই। এই পশ্চিমবঙ্গ থেকেও বিপ্লবের ইশারা ভারতবর্ষ পাবে ও সেখান থেকে তৃতীয় দুনিয়া পাবে ও সেখান থেকে বিশ্ব পাবে? ভাল। পাক। সৌরাংশু সেই পশ্চিমবঙ্গেও নেই, ভারতবর্ষেও নেই, তৃতীয় দুনিয়াতেও নেই।

সৌরাংশু এখন তাঁর কর্মজীবনের প্রায় শেষে এসে এই কথা মেনে নিয়েছেন—তিনি যে-অর্থনীতি পড়ান সেটা বিজ্ঞান নয়, নকল বিজ্ঞান, বা, হয়ত সৌরাংশু এ-কথাও বলতে চান, ভুল বিজ্ঞান। ভুল বিজ্ঞান শব্দটি হয়ত ঠিক হবে না, বলা উচিত বিজ্ঞানের মোহ। অর্থনীতি এই ভুলকে বিশ্বাসের ভিত দেয় যেন সে একটা বিজ্ঞান, ফলে অর্থনীতির চর্চা আসলে মানুষকে বিজ্ঞানের শৃঙ্খলা থেকে ও শিল্প থেকে সরিয়ে আনে। অর্থনীতি বিজ্ঞানবিরোধী এ-কথাটাও ঠিক নয়। সৌরাংশু তাঁর হাঁটার গতিতে, অধৈর্যে, তাড়াতাড়ি ইংরেজি মিশিয়েই তাঁর ভাবনাটা শেষ করে দিতে চান, অর্থনীতি আসলে বিজ্ঞানের ফলস কনসাসনেস।

এইটাই যে তিনি সত্যি-সত্যি ভাবতে চান, তা হয়ত নয়। সৌরাংশুকে যদি এই নিয়ে বলতে হত বা লিখতে হত তা হলে তিনি হয়ত সব কিছু বলেও 'প্রায়বিজ্ঞান' শব্দটিই ব্যবহার করতেন। শেষ পর্যন্ত তিনি হয়ত এটুকু স্বীকার করতেন যে অর্থনীতিও একটা সত্য বোঝার চেষ্টা। কিন্তু এখন রাস্তা দিয়ে হাঁটতে-হাঁটতে, খিদেয় পেট ব্যথা শুরু হবে এমন শরীর নিয়ে হাঁটতে-হাঁটতে, পাশ দিয়ে মিনিবাসগুলো যে-হর্ন বাজিয়ে ডাকতে-ডাকতে শ্লথগতিতে যাচ্ছে, তা শুনতে-শুনতে হাঁটতে-হাঁটতে, তৃষ্ণায় শুকনো কণ্ঠনালী নিয়ে হাঁটতে-হাঁটতে, সৌরাংশু নিজের কাছে এই সিদ্ধান্তেই আসতে চান, অর্থনীতি বিজ্ঞানের মোহ।

এতটা হেঁটে এসে বুঝতে পারছেন, ম্যাকাডাম থেকে সারা

দিনের তাপ এখন বিকিরিত হচ্ছে, সেই তাপের আঁচের ভিতর তিনি হাঁটছেন। তিনি চৈত্রবিকেলের রাস্তার স্নিগ্ধতার কথা ভেবে যদি হাঁটা শুরু করে থাকেন—ভুল করেছিলেন। তিনি আরো ক্লান্ত হওয়ার জন্যে যদি হাঁটা শুরু করে থাকেন—ঠিক করেছিলেন। তিনি প্রায় আগুনের হলকা গায়ে লাগিয়ে হাঁটছেন। এ-রকম আরো কিছুক্ষণ হাঁটলে তাঁর সারা শরীর সাঁতলে উঠবে।

অর্থনীতিকেই তিনি এখন এই নিভৃতিতে প্রত্যাখ্যান করতে চাইছেন কেন? বা শমিতার সঙ্গে আজকের দীর্ঘ বিনিময়ে বারবার প্রত্যাখ্যান করতে চাইছিলেন কেন? শমিতার সঙ্গে বিনিময় তাঁর কিছু ঘটেছে কিনা, তা নিয়ে এখন তিনি ভাবছেনও না। শমিতা ত তাঁর কাছ থেকে কিছু পেয়ে থাকতেই পারে। কিন্তু তিনি যে শমিতার লেখাগুলো থেকে অর্থনীতির বিরুদ্ধে নিজের একটা অবস্থান তৈরি করে তুলেছিলেন—তাতে তাঁর নিজের কোনো আগ্রহ নেই। না, শমিতা, আমার ভিতরে বিনিময়যোগ্য উদ্বৃত্ত কিছু নেই, ইতিহাস যখন নিঃশেষ করে তখন নিঃসীম করেই নিঃশেষ করে।

হয়ত আরো অনেকের ভিতরটা এত ফাঁপা হয়ে যায়নি। সেখানে এখনো হয়ত অর্থনীতিই প্রধান প্রক্রিয়া ও পদ্ধতি হিশেবে কাজ করবে। তাঁদের ভিতরটায় ইতিহাস হয়ত অতটা নিজেকে ঢুকিয়ে দিতে পারেনি এখনো, যে ভিতরটা একেবারে খালি হয়ে যাবে।

কিন্তু তাঁর ক্ষেত্রে, বা তার মত আরো অনেকের ক্ষেত্রে নিশ্চয়ই সব শূন্য হয়ে গেছে।

সৌরাংশু নিজের ওপর বিরক্ত হয়ে হঠেন। চিন্তার এই ধরণটাকেই তিনি বর্জন করতে চাইছেন অথচ চিন্তার এই ধরণটাই ফিরে-ফিরে আসছে—কতগুলো প্রমাণ বা স্যাম্পলিং হলে তাকে একটা ট্রেন্ড বা ধরণ বলা যাবে? হায়, নিজের জ্ঞানতত্ত্ব যখন ধ্বংস হয়ে গেছে তখনো সৌরাংশু নিজেই নিজের ছাত্রের মত নিজেকে গড়নির্ণয়ের পক্ষে যথেষ্ট প্রতিনিধিস্থানীয় তথ্য হিশেবে মেনে নিতে পারছেন না—অর্থনীতিবিজ্ঞানের পদ্ধতি তাঁর এমনই মজ্জাগত হয়ে গেছে?

অথচ মজ্জাগত হয়ে যাওয়ার কথা ত মার্ক্সবাদ। মার্ক্সবাদের দর্শনকে কখন একসময় অর্থনীতির তত্ত্বই খেয়ে বসে আছে সৌরাংশু তা খেয়ালও করেননি। না সোভিয়েত ইউনিয়নে নয়, চীনেও নয়, পূর্ব ইয়োরোপেও নয়। সৌরাংশুর নিজেরই মধ্যে। সৌরাংশুর কোনো অছিলার দরকার নেই। সৌরাংশু, সৌরাংশুরা অর্থনীতিকে মার্ক্সবাদ বলে জাহির করে এসেছেন। না, সৌরাংশুরা নয়, সৌরাংশুই, একা সৌরাংশু।

যদি খুব সরল সূত্রেও আত্মবিচার করেন, তাহলে সৌরাংশু কি এমন ভাগ করতে পারবেন তাঁর আস্তিক্য, মার্ক্সবাদ, আর তাঁর জ্ঞানতত্ত্ব, অর্থনীতি, কোথায় পৃথক ছিল? সৌরাংশু কি এখন নিশ্চিত করে বলতে পারবেন তাঁর জ্ঞানতত্ত্ব, অর্থনীতি, তাঁর আস্তিক্যকে, মার্ক্সবাদকে সম্পূর্ণ গ্রাস করে নেয়নি?

পূর্ব ইয়োরোপের দেশগুলিতে অর্থনীতির সংকট চলছিল। ১৯৮৯-এ সোভিয়েতে মৌলিক পরিবর্তনের শুরু আর পূর্ব ইয়োরোপে একটার পর একটা 'শাসন' ধ্বংস। কিন্তু অর্থনীতির সংকট রাজনীতির ধ্বংস নিশ্চিত করেছিল—এ-ব্যাখ্যা আর চলে না। চেকোশ্লোভাকিয়াতেও কমিউনিস্ট পার্টির নেতৃত্ব ধসে গেল—অথচ চেকোশ্লোভাকিয়ায় কোনো অর্থনৈতিক সংকট ছিল না, সেখানকার দোকানে জিনিসপত্তর পাওয়া যাচ্ছিল। পোল্যান্ডে, রোমানিয়ায়, সোভিয়েতে, চেকোশ্লোভাকিয়ায় একই রাজনৈতিক ঘটনা ঘটল অথচ অর্থনীতির চেহারা সব ক্ষেত্রেই আলাদা। যদি অর্থ-নৈতিক সংকট থেকেই রাজনীতির বদল আসবে—তাহলে ত তা আসতে পারত ১৯৩৩, ৪২ বা ৭০-এর সোভিয়েতে, বা আই. এম. এফ-এর ঋণবন্ধ মেক্সিকোয়, তানজানিয়ায় বা এখনকার ভারতবর্ষে।

না, সমাজতান্ত্রিক দুনিয়ায় এটা কোনো 'সসেজ বিপ্লব' নয়। মানুষের অনুভবের একটা নিজস্ব গতি আছে, মানুষের বুঝে যাওয়ার একটা নিজস্ব পদ্ধতি আছে। সেই গতি আর পদ্ধতিই মানবইতিহাসের কার্যকারণ হয়ে ওঠে। মানুষের আপত্তিই সোভিয়েত ও পূর্ব ইয়োরোপের শাসকদের শাসন ক্ষমতা থেকে সরিয়েছে, মানুষের নৈতিক আপত্তি, মানুষের খিদে নয়। খিদে নয়।

সৌরাংশু নিজের শরীরের ভিতরে খিদের কামড় সইতে-সইতে নিজেকে এটাই বোঝাতে লাগলেন, খিদে নয়, খিদে নয়। খিদে থেকে বার্লিন দেয়ালের ঐ কংক্রিটের টুকরো মার্কিন ব্যবসায়ীদের হাতে পণ্য করে দেয়া হয় না।

সমাজতান্ত্রিক প্রতিশ্রুতি আর বাস্তবতার ভিতর ফারাক ঘটতে-ঘটতে কোন্ এমন খাত তৈরি হয়ে গেল যার ওপর কোনো সেতু-বন্ধন সম্ভব ছিল না? এই মহাদেশতুল্য বিচ্ছিন্নতাই মানুষ তার বোধ আর অনুভব দিয়ে ভরে তোলে। গত সত্তর বছর ধরে সোভিয়েতে ও সমাজতান্ত্রিক দুনিয়ায় মানুষ সেই চেষ্টাই করেছে—তারা তাদের আস্তিক্যকে রক্ষা করতে চেয়েছে, কোনো জ্ঞানতত্ত্বের কাছে আস্তিক্য বিকিয়ে দিতে চায়নি। শেষে, শতাব্দীর শেষ দশকে এসে মানুষ ঘুরে দাঁড়াল, তার আস্তিক্যের ওপর নির্ভর করে কমিউনিস্ট পার্টিগুলি যদি আসলে কতকগুলো লোকের বা বড় জোর কিছু গোষ্ঠীর প্রতিষ্ঠান হয়ে থাকে তা হলে চুলোয় যাক তার জ্ঞানতত্ত্ব, মানুষের অন্তত নিজের আস্তিক্যের পক্ষে বিদ্রোহের অধিকারটুকু থাক।

সৌরাংশুর তেমন কোনো বিদ্রোহই নেই, তিনি তাঁর আস্তিক্যের পক্ষে কোন অধিকার প্রয়োগ করবেন? তার চাইতে তাঁর আত্মধ্বংসই ভাল। বা, আত্মধ্বংসও যদি একটু বড় কথা হয়, তা হলে তাঁর নীরবতাই ভাল। নীরবতাও যদি একটা সক্রিয়তা বোঝায়, তা হলে সৌরাংশুর নিবে যাওয়াই ভাল। আয়ুর শেষে মানুষের শরীর যে-রকম নিবে যায়।

দুনিয়াকে বদলে দিয়ে যে-নতুন দুনিয়া বানানো হয়েছিল, এতদিন যা ভাবা হয়েছে তা বাতিল করে দিয়ে যে-নতুন ভাবনা ভাবা হয়েছিল, আস্তিক্য আর জ্ঞানতত্ত্বের কোন্ জায়গাবদলে, সেই নতুন দুনিয়া হয়ে দাঁড়ায় একটা পার্টি হেডকোয়ার্টার, সেই নতুন চিন্তা হয়ে যায় নিষিদ্ধ? বুর্জোয়া পশ্চিমের ওপরে সোভিয়েতের মানবিক প্রাধান্য হয়ে দাঁড়ায় শুধু সমাজতান্ত্রিক প্রচার পুস্তিকার বিষয়? যাকে তার পাশের ফ্ল্যাটের লোকও ভরসা করে না বা দৈনন্দিন কোষ্ঠ পরিষ্কার বা ব্লাড প্রেশারের চাইতে বেশি কিছু যার মননের বিষয় হতে পারে না পার্টির বকলমে এমনই এক কেরানি

নিষ্প্রাণ উচ্চারণে বকে যায় শ্রমিক শ্রেণীর কথা, চরম বিজ্ঞানের কথা, জাতির কথা, মানবতার কথা। সোনা দিয়ে যাদের বাথরুম বানানোর কথা, তারা বিদেশী পর্যটকের কাছে লুকিয়ে ডলার কেনে। মানুষ যখন এই কেরানিটিকে চিনে ফেলল—প্রাগে, বুদাপেস্তে, লিপৎসিগে—তখন, সেই মুহূর্তে ধরা পড়ে গেল, কঠিন তত্ত্বকে রক্ষা করতে আর বিশ্ব ধনতন্ত্রকে রুখতে প্রস্তুত ও দক্ষ প্রশাসন, ও সদাপ্রস্তুত সর্বশক্তিমান শাসকের জায়গায় সব ফাঁপা ফাঁকা পড়ে আছে। কিছু জবু-থবু বুড়ো লোক তাদের নিজেদের ক্ষমতাতেই বিশ্বাস হারিয়ে অনড় বসে আছে। তারা আত্মরক্ষাও করতে জানে না। তাদের বাঁচাতেও কেউ নেই। এই সমাজতান্ত্রিক ব্যবস্থা থেকেই ত তখনো নিজেদের সুবিধেজনক সুখ ও স্বাচ্ছন্দ্য দোহন করেছিল কয়েক লক্ষ লোক। রাষ্ট্রের সেনাবাহিনীর বন্দুকে কার্তুজের অভাব ছিল না কিন্তু রোমানিয়া ব্যতীত কোথাও একটা গুলিও চলেনি। পূর্ব ইয়োরোপের অন্যত্র সমাজতান্ত্রিক ব্যবস্থা ধসে গেল কলকাতা কর্পোরেশনের বহু নোটিশ খাওয়া সাতকেলেনে পচা বাড়ির মত, একটা আধাখানেক বর্ষার শুরুতেই।

যারা সমাজতন্ত্রকে সমর্থন করত, যারা সমাজতন্ত্রের জন্যে প্রজন্মের পর প্রজন্ম মূল্য দিয়ে আসছে, যারা সমাজতন্ত্রের মানব-ভিত্তি নির্মাণ করেছে—তারা ত সে-সবই করত রাজনীতিতে ও ব্যক্তিজীবনে ভালমন্দের এক নৈতিক নিরিখের প্রতি আনুগত্য থেকে। কেউ তা করেছে সুন্দর-অসুন্দরের এক নিরিখ থেকে—মানুষের পক্ষে যে-পথ সুন্দর, যে-গতি সুন্দর। সমাজতন্ত্র ত যুক্তি দিয়ে তৈরি ছিল না। সমাজতন্ত্রই ত তাদের কাছে কিটসের কবিতা—সত্য আর সুন্দর। সমাজতন্ত্রের সেই নীতি আর সৌন্দর্যই তার কর্মীদের এমন পরাক্রান্ত করে তুলেছিল—মানুষের ইতিহাস বদলে দেবার এমন সামর্থ, আগে কখনো এমন সংগঠিত আকার নেয়নি।

সৌরাংশুদের জীবনময় সেই সত্য আর সৌন্দর্য ছড়িয়ে আছে। যুদ্ধজাহাজ অরোরা থেকে কামানের গোলা, শীতপ্রাসাদ অভিযান, সোভিয়েত সরকারের প্রথম ডিক্রি, পৃথিবীর অর্থনীতির ইতিহাসে প্রথম কেন্দ্রীয় পরিকল্পনা, লেনিনগ্রাদ, স্তালিনগ্রাদ, বার্লিনের

পতন, লঙমার্চ, ভিয়েতনামের যুদ্ধ, কিউবার আখখেতের বিপ্লব—সৌরাংশুদের জীবনের অংশ। কিন্তু এত তাড়াতাড়ি, এত আচম্বিতে এ-সবই রূপকথা হয়ে যাবে তার জন্যে সৌরাংশুর আস্তিক্য সৌরাংশুকে প্রস্তুত রাখেনি। শেষ পর্যন্ত কমিউনের কাহিনী আর ভিয়েতনামের কাহিনী মিলে যাবে স্পার্টাকাসের কাহিনীর সঙ্গে? তাও আবার বিশ্ববাসীদের জন্যে। কোথাও কোনো বিশ্বাসী নিশ্চয়ই আছে। তৃতীয় দুনিয়ায় আছে, দ্বিতীয় দুনিয়ায় আছে, প্রথম দুনিয়ায় আছে। এখনো ত দেশে-দেশে কমিউনিস্ট আন্দোলন চলছে। চলছে, চলবে। সৌরাংশু যে-রাস্তা দিয়ে হাঁটছেন সেই রাস্তাই ত মিছিলের রাস্তা। সারা ভারতে পশ্চিমবঙ্গই ত কমিউনিস্টদের বিজয়নিশান।

কিন্তু সৌরাংশু আর রূপকথায় ফিরে যেতে পারবেন না। তাও হয়ত ঠিক নয়। যা ছিল তাঁর জীবন, তাকেই এখন রূপকথা মেনে নিয়ে জীবন থেকে সরে যেতে পারবেন না। তাঁর জীবন যদি রূপকথাহীন হয়ে গিয়ে থাকে, তবে, তাঁর পক্ষে ঐ রূপকথাও জীবনহীন হয়ে গেছে। মানুষ নিজের জীবন দিয়ে অন্যের জন্যে রূপকথা তৈরি করে দিতে পারে, কিন্তু তার নিজের কাছে ত সেটা কঠিন জীবনই।

সৌরাংশু অনেক দূর এসে পড়েছিলেন—ভিতরটা ঘামে ভিজে উঠেছে, শরীরের ভিতরে দু-একজায়গায় ঘামের প্রবাহও বুঝতে পারছেন, হাঁফ ধরেছে, এবার ওঁকে একটা কিছু নিতে হবে। ট্যাক্সি নেবেন না, এত তাড়া নেই তাঁর। বা, তাঁর ক্লান্ত হওয়াটা এখনো শেষ হয়নি যেন।

একটা ছোট মিছিলের জন্যে যোধপুর পার্ক-ঢাকুরিয়ার ওখানে একটু জটলা হয়েছে। কয়েকটি মাত্র লোক লাইন বেঁধে রাস্তা পার হচ্ছিল—এলোমেলো। এখনি রাস্তা পরিষ্কার হয়ে যাবে। সৌরাংশু দাঁড়িয়ে ছিলেন পশ্চিমের ফুটপাথে—এই মানুষরা পুবের ফুটপাথ থেকে পশ্চিমের ফুটপাথে উঠছিল। নেহাত লাইন বেঁধে আসছে বলেই তারা এখন একসঙ্গে পার হচ্ছে, ট্র্যাফিক থমকে আছে। কিন্তু মিছিলের মাথাটা সৌরাংশুকে ছাড়িয়ে দক্ষিণে উঠেছে। ফলে, সামনের দুজন মহিলার হাতে যে আধময়লা

ফেস্টুনটা আছে, সেটা সৌরাংশু ঠিক পড়ে উঠতে পারেন না। যারা ফেস্টুন ধরে আছে তারাও এক লাইনে নেই, তারাও এক রকম করে ফেস্টুনটা ধরে নেই। একজন আগে ও একজন পিছে বলে ফেস্টুনটা মাঝখানে ভাঁজ খেয়ে পেছন দিকে হেলে গেছে। সৌরাংশু ত ফেস্টুনটা দেখতেই পাননি। দেখতে পেলেও পড়তে পারতেন না।

ফেস্টুনটা আধময়লা, অনেক দিন ধরে ব্যবহৃত হচ্ছে। মিছিলের দু-একজনের হাতে দুটো-একটা পোস্টার লাঠির আগায় বাঁধা। সেগুলোও পুরনো। কাগজের ও লেখার রঙ জ্বলে গেছে, লাঠিটা একটু কাত হয়ে পড়েছে। বোধহয় এই মিছিল অতীতে কোনো এক সময় বৃষ্টির ভিতর দিয়ে হেঁটেছিল, পোস্টারের অক্ষরগুলো সেই বৃষ্টির জলে ভিজে কোথাও-কোথাও গলে গেছে। তারপরও এ-মিছিলটাকে হয়ত কড়া রোদে, হাঁটতে হয়েছিল। পোস্টার যে-কাগজের ওপর লেখা সেগুলো একটু লালচে, হয়ত কোথাও-কোথাও ফুলেও উঠেছে, দু-এক জায়গায় চুলের মত ফাটলও ধরেছে হয়ত-বা। সে-সব সৌরাংশু দেখতে পাচ্ছেন না কিন্তু দেখতে না পেলেও দেখা যায় যেমন সৌরাংশু তেমনই দেখছিলেন।

কিন্তু মিছিলটা ত তিনি দেখতেই পাচ্ছিলেন। দেখতে পাচ্ছিলেন অথচ কী স্লোগান উঠছে শুনতে পাচ্ছিলেন না। এমন হতে পারে—দেখছিলেন বলেই শুনছিলেন না। কিন্তু মিছিলের আওয়াজ শুনেই ত লোক ঘর ছেড়ে ছুটে বাইরে আসে দেখতে। অথচ, এমনও হয় যে মিছিল দেখলেও মিছিল শোনা যায় না।

সৌরাংশু দেখছিলেন—সব মিলিয়ে জনাপঞ্চাশ মত হলেও হতে পারে। তার ভিতর বেশ কিছু মহিলা আছে—তাঁদের কারো-কারো পরনে শাদা শাড়ি, একেবারে শাদা শাড়ি। পেছন থেকে দেখলেও গ্রামের অসহায় বিধবাদের মত চেহারা। দু-একজন মহিলার পরনে রঙিন শাড়ি আছে বটে কিন্তু সে-রঙও এত জ্বলে গেছে যে মনে হচ্ছে জমাটবাঁধা ময়লা। দু-একজন মহিলার হাতে ধরা কমবয়েসি বাচ্চা, একজনের কোলেও। এরা মিছিলেও হাঁটছে এমন করে যেন বাড়ির উঠোন পেরচ্ছে।

পুরুষদের পোশাকগুলো আলাদা নজরে পড়ে না—তবে

কেউই খালি গায়ে নেই। যেমন পুরুষদের পোশাক হয় তেমনি হবে—কারো প্যান্ট, কারো ধুতি। এখান থেকে মনে হল, ওদিকের লাইনে একজন বোধহয় লুঙি পরেও হাঁটছে। পুরুষদের চলনেও কোনো ব্যস্ততা নেই। দূরত্বটা জানা থাকলে যেমন অলস পা ফেলে বা একই ছন্দে হেঁটে দূরত্বটা পেরতে হয়, মিছিলের মানুষরা সেই ভাবে পা ফেলছিল, সেই ছন্দে হাঁটছিল। পুরুষদের এমন হাঁটার ধরণে মনে হয়, এই মিছিলটা এ-রকম গতিতেই বহু দূর পথ পেরবে। মিছিলে যে-মহিলারা বা পুরুষরা হাঁটছিল তাদের ভঙ্গির এই ব্যক্তিগত ধরণ সত্ত্বেও মিছিলটা নির্ভুলভাবেই মিছিল, এতটাই নির্ভুল মিছিল যে ঢাকুরিয়ার-যোধপুরের বড় রাস্তার ট্রাফিক থমকে থাকে।

সে-নির্ভুলতা কি আসে এতগুলো মানুষের সারি বেঁধে হাঁটায়? নাকি হাতে ধরা পোস্টারে-ফেস্টুনে? সৌরাংশু দেখছিলেন, হাতে ধরা বাচ্চারা তাদের নিজেদের ছন্দে হাঁটতে চাইছিল এদিক-ওদিক চোখ মেলতে-মেলতে, কিন্তু যাদের হাতে হাত ধরা, তারা বাচ্চাদের টেনে নিয়ে যাচ্ছিল। বোধহয় ঐ একটি বৈষম্যেই বোঝা যাচ্ছিল, মিছিলের নিজস্ব ছন্দেই সবাইকে হাঁটতে হচ্ছে, কিন্তু বয়স্করা সেই ছন্দের সঙ্গে নিজের হাঁটার ছন্দ মিলিয়ে নিতে পারছে, ছোটরা পারছে না, মিছিল তাদের টেনে নিয়ে যাচ্ছে। ঐখানে মিছিল, নির্ভুল মিছিল।

মিছিলটার মানুষজনের সংখ্যা, তাদের চলনের অভ্যস্ততা, তাদের পা ফেলার গতি, তাদের ভঙ্গির কিছুটা শৈথিল্য—সব মিলিয়ে মিছিলটাকে বহুদূরে যাবার মিছিল কল্পনা করা যেত। কিন্তু সব মিছিলই ত কলকাতায় আসে, কলকাতা থেকে আর কোন মিছিল কতদূর যেতে পারে? আর, যাবেই-বা কেন এখন, এমন একটা মিছিল? কিন্তু সৌরাংশু দেখতে পান বা দেখতে চান, মিছিলটা যেমন নির্ভুল মিছিল, মিছিলটার প্রাচীনতা যেমন নির্ভুল, মিছিলটার অন্তর্গত দূরত্বও তেমনি নির্ভুল।

কিন্তু সৌরাংশু নিশ্চিত জানেন—মিছিলটা বেশি দূর যাচ্ছে না, হয়ত কাছাকাছি কোথাও কোনো সভা আছে—সেখানে যাচ্ছে। বা, হয়ত এখানে শমিতা রেলকলোনির মত কোনো কলোনি

উচ্ছেদ করা হচ্ছে সেখানকার মানুষজন প্রতিবাদ করে যাচ্ছে অনেক দিন ধরে, প্রতিবাদ করে যেতেই হবে এই বাধ্যতা থেকেই কারণ তারা তাদের অস্তিত্ব দিয়ে জেনেছে এ-রকম প্রতিদিনের রোদেজলের প্রতিবাদ ছাড়া তারা তাদের ভিটে রক্ষা করতে পারবে না। শমিতার লেখার মানুষজনকে সৌরাংশু মিছিলে দেখতে চান। হতে পারে কাছাকাছি কোনো ছোট কারখানা অনেক দিন হল বন্ধ হয়ে আছে, এমন-কি লোকের বাড়ির গ্যারাজে যে ধরনের ছোট কারখানা হয় তেমন কারখানাও হতে পারে। এরা হয়ত সেই সব বেকার কর্মীদের আত্মীয়স্বজন, বাড়ির লোকজন। স্থানীয় স্তরে বা রাজনৈতিক দল মারফত হয়ত কিছু কথাবার্তা চলছে। সেই কথাবার্তাটাই হয়ত এদের একমাত্র ভরসা, কথাবার্তাটা চালু রাখা। আর সে-কথাবার্তা চালু রাখতে হলে এটা ত ভুলতে দেয়া যায় না যে এই কর্মীরা বেকার হয়ে আছে, তাদের পরিবার-পরিজন বেকারের পরিবার-পরিজন। হয়ত, নিজেরাও মনে রাখতে, আর যারা মনে রাখতে চায় তাদের মনে করিয়ে দিতে মিছিলটা এ-রকম মাঝে মধ্যে বেরয়। তেমন মনে রাখতে ত কেউ চায় না, তেমন কারো মনে থাকেও না। কিন্তু সৌরাংশু বোঝেন, এই মিছিল এই শহরের মানবদৃশ্যের অংশ হয়ে থাকতে চায়; অবিচ্ছেদ্য অংশ—যেমন এই লাল কৃষ্ণচূড়া, ঐ গুলমোর এই শহরের এই চৈত্রবিকেলের প্রাকৃতিক দৃশ্যের অবিচ্ছেদ্য অংশ। অবিচ্ছেদ্যতার সে-আকাঙ্ক্ষা তৈরি হয়েছে সংগঠিত প্রতিশ্রুতি-প্রতিবাদের গভীর আস্তিকতা থেকে। সেই আস্তিকতায় মিশে আছে সত্য আর সৌন্দর্যের এক সমষ্টিবোধ।

না, সৌরাংশু ঐ ভাঙাচোরা, ময়লা, প্রাচীন, দূরগামী-ছন্দে-চলমান মিছিলের টুকরো থেকে কোনো বিশ্বাস সংগ্রহ করেন না। করতে চান না। তাঁর আস্তিক্য আর জ্ঞানতত্ত্বের অদ্বৈত এমনই ভেঙে গেছে যে এই একটা মিছিলের সত্য আর সৌন্দর্য তা জোড়া লাগাতে পারবে না। সৌরাংশু ইচ্ছে করলেও আর জোড়া লাগাতে পারবেন না। দার্শনিকরা এতদিন দুনিয়াটাকে ব্যাখ্যা করেছেন, এখন কাজ দুনিয়াটাকে বদলানো—সে-কাজ সৌরাংশুদের পক্ষে অনির্দিষ্ট কালের জন্যে মুলতুবি ঘোষিত হয়ে গেছে। কিন্তু

সৌরাংশু জানেন, তিনিই একমাত্র লোক নন, তাঁরাই একমাত্র লোক নন। এমন-কি তাঁর কোনো প্রতিনিধিত্ব নেই। তিনি কারো প্রতিনিধি নন। যে-মানুষের নিজের আস্তিক্য ধ্বস্ত তাঁর প্রতি-নিধিতা নেই। সৌরাংশু জানেন, এই মিছিলও আছে, এই মিছিলের সত্য আর সৌন্দর্যও নিশ্চয়ই আছে—সেই সত্যকে বুঝতে আর সুন্দরকে অনুভব করতে চায় যে, তার জন্যে।

সৌরাংশু কেবল জানেন—তিনি আর সেই লোক নেই।

রাস্তা পেরতে ঐটুকু মিছিলের আর কতক্ষণ লাগে? তারপরই ট্র্যাফিক খুলে যায় স্লুইসখোলা স্রোতের মত। সৌরাংশু একটা বাড়িমুখো মিনিতে উঠে পড়েছিলেন।

অনেকটা রাস্তা, খিদেয় ক্লান্তিতে তাঁর সারা শরীর অবসাদে নুয়ে পড়তে চায়। পার্ক সার্কাসের কাছে একটা বসার জায়গা পেয়েছিলেন। বাকি রাস্তাটুকুতে কোনো এক সময় আচ্ছন্ন তাঁর মনে এসেছিল—সমুদ্র বা পাহাড় বা জঙ্গলের মত সম্পূর্ণ নতুন কোনো প্রাকৃতিক দৃশ্যের কাছে যদি এখনই পৌঁছনো যেত!

এমন কোনো জ্ঞানতত্ত্ব যদি তিনি নতুন করে আয়ত্তে আনতে পারতেন—পৃথিবী ঘেরা জলরাশি সূর্য আর চাঁদের টানে মহা-দেশহীন কেমন গড়িয়ে যায়; কোন সমুদ্রের কোন অতল থেকে উত্থিত বায়ুপ্রবাহ বৃষ্টি চয়ন করতে-করতে ছুটে যায় দেশের সীমানাহীন কোন পর্বতগাত্রে আছড়ে পড়তে; সমুদ্র-তৃণভূমি-নগর-মরুপ্রান্তর-তুষারক্ষেত্রের ওপর সূর্যের তাপ কী বদল ঘটিয়ে যাবে কালনিরপেক্ষ; আরো কত শতাব্দী পরে পৃথিবীর মাটির কোথায় কত বৃষ্টি ধরবে, কোথায় কত বরফ গলবে; কোন পাখির প্রজাতি শেষ হয়ে যাবে; মাটির তলার জল কোন ভূখণ্ডে কোনদিকে সরে যাবে; নতুন কোন পতঙ্গ মাটিতে উড়বে; যাযাবর পাখিদের আকাশপথ কত বদলে-বদলে যাবে!